শব্দ-কথা

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌. এ.

প্রকাশক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি,
কলিকাতা

১৩২৪

মুখবন্ধ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; প্রবন্ধগুলি এত কাল পরিষৎ-পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল; শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকল প্রবন্ধই সংশোধন করিয়াছি। ধ্বনি-বিচার নামে প্রবন্ধটির কলেবর বাড়িয়া গিয়াছে।

ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধটির প্রতি আমার একটু মমত্ব আছে। বোধ হয়, আমি উহাতে কিছু নূতন কথা বলিয়াছি। এইরূপে বাঙ্গলা শব্দের আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, জানি না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন, টুকটুকে শব্দটি নিশ্চয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যাহা টুক্ টুক্ ধ্বনি করে, তাহাই টুক্‌টুকে। কিন্তু যে দ্রব্য রাঙা টুকটুকে, তাহা ত কোনরূপ টুকটুক শব্দ করে না;—তবে তাহাকে টুকটুকে বিশেষণ দিই কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী;—আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না।

ঐ ইঙ্গিত লইয়াই বাঙ্গলায় প্রচলিত ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলিকে আমি শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সাজাইয়াছি। দেখিয়াছি যে প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-বর্গের ধ্বনি জন্মে; কোমল দ্রব্যের আঘাতের সহিত ত-বর্গের ধ্বনির সম্পর্ক; ফাঁপা জিনিষের ভিতর হইতে বায়ু নিঃসরণে প-বর্গের ধ্বনি জন্মে; ইত্যাদি। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবতঃ কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক একটা বস্তুধর্ম্মের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিতা রাখে; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবা-মাত্র ঐ ঐ ধর্ম্ম স্মরণ করায় বা ব্যঞ্জনা করে। যাহা টুকটুকে লাল, তাহা চোখে এমন কঠোর আঘাত দেয়, যে সেই আঘাত টুকটুক ধ্বনির কাণে আঘাতের কঠোরতা স্মরণ করায়; দৃষ্টিগত আঘাতটাও যেন কঠোরতায় শ্রুতিগত আঘাতের অনুরূপ। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির এইরূপ এক একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির মধ্যে আবার অল্পপ্রাণতা বা মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা বা ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্য্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। প বর্গের বর্ণমধ্যে প ও ফ উভয়েই বায়ুপূর্ণতা বা শূন্যগর্ভতা স্মরণ করায়; কিন্তু প'র চেয়ে ফ'র জোর যেন অধিক; ব'র চেয়ে ভ'র স্থূলতা যেন অধিক। এই স্থূলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাদি শব্দ স্থূলতা মনে আনে, এবং স্থূলতার সহকারী আলস্য ঔদাস্য প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মও মনে আনে। মূলে যাহা ধ্বন্যাত্মক, বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বাড়িয়া যায়। বহু দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমি যে সকল দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাদের অনেকের হয় ত সংস্কৃত ভাষা হইতে মূল আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ধ্বনি বিচার প্রবন্ধ

যখন লিখিয়াছিলাম, তখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অপূর্ব্ব শব্দকোষের রচনা আরব্ধ হয় নাই। যোগেশ বাবু সংস্কৃত মূলাকর্ষণের পক্ষপাতী; তিনি তাঁহার শব্দকোষে এই শ্রেণির যাবতীয় শব্দের সংস্কৃত মূল আকর্ষণে চেষ্টা করিয়াছেন; আমার সহিত পত্রব্যবহারেও তিনি সেই পক্ষপাত পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

ইংরেজি ভাষাতত্ত্বে আমার কিছুমাত্র বিদ্যা নাই। ইংরেজি ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার আমি কোন খোঁজ রাখি না। সম্প্রতি হেনরি ব্রাডলি প্রণীত The Making of English (Mac Millan, 1916) নামে একখানি পুস্তক হঠাৎ আমার হাতে পড়িয়াছিল; তাহাতে দেখিলাম এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। গ্রন্থকার Root-creation বা ধাতু-সৃষ্টি প্রকরণে ধ্বনিমূলক শব্দের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন; নিম্নের উক্তিগুলি প্রণিধান-যোগ্য।

"The sound of a word may suggest 'symbolically' a particular kind of movement or a particular shape of an object. We often feel that a word has a peculiar natural fitness for expressing its meaning, though it is not always possible to tell why we have this feeling. Quite often the sound of a word has a real intrinsic significance; for intance, a word with a long vowel, which we naturally utter slowly, suggests the idea of slow movement. A repetition of the same consonant suggests a repetition of movement. Sequences of consonants which are harsh to the ear, or involve difficult muscular effort in utterance, are felt to be

appropriate in words descriptive of harsh or violent movement. (pp. 156-157). গ্রন্থকার অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা হইতে আমি প্রচুর দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষার দৌড় বোধ করি ইংরেজির চেয়ে অনেক বেশী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা-সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি, যে কাগজ কলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্ত্তার এবং অনুবাদকের হাতে। তবে প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, অথবা আধুনিক সাহিত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তালিকা করিয়া দিলে এ কালের লেখকদের কতকটা সাহায্য হইতে পারে। এই মনে করিয়া আমি বৈদিক সাহিত্য হইতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলাম, এবং ব্রেটন সাহেবের ও মাক সাহেবের বহি হইতে যে তালিকা পাইয়াছিলাম, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করি। সাহেবদের শব্দগুলিতে কাজ যতটা না হউক, কৌতুক অনেকটা পাওয়া যাইবে। এতদর্থে আজিকার বাজারের কাগজের দাম যোগাইয়াও সেই তালিকাগুলি গ্রন্থস্থ করিলাম। রাসায়নিক পরিভাষা প্রবন্ধের শেষে রসায়ন শাস্ত্রের কতকটা পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহা এখন প্রকাশের যোগ্য বোধ করিলাম না।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩২৪

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সূচি

ধ্বনি বিচার (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪, ২ সংখ্যা)… ১

কারক-প্রকরণ (ঐ, ১৩১২, ২ সংখ্যা) … ৭৬

না (ঐ, ১৩১২, ২ সংখ্যা) … ১০৬

বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত (ঐ, ১৩০৮, ৪ সংখ্যা) … ১১৩

বাঙ্গলা ব্যাকরণ (ঐ, ১৩০৮, ৪ সংখ্যা) … ১১৮

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (ঐ, ১৩০১, ২ সংখ্যা) … ১৬১

শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা (ঐ, ১৩১৭, ৪ সংখ্যা) … ১৭৮

বৈদ্যক পরিভাষা (ঐ, ১৩০৬, ৪ সংখ্যা) … ১৯০

রাসায়নিক পরিভাষা (ঐ, ১৩০২, ২ সংখ্যা) … ২১৯

বাঙ্গলার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ (ঐ, ১৩০৫, ৪ সংখ্যা) … ২৩৪

ধ্বনি-বিচার

মহাকবি কালিদাস বাক্যের সহিত অর্থের সম্পর্ক হরগৌরীর সম্পর্কের মত নিত্য জানিয়া বাগর্থপ্রতিপত্তির জন্য হরগৌরীকে বন্দনাপূর্ব্বক মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহা পণ্ডিতেরা অদ্যাপি মাথা খুঁড়িয়াও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ভাষার অন্তর্গত কতকগুলি শব্দ নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের এইরূপে উৎপত্তি বুঝা যায় না। কা কা করে বলিয়া কাকের নাম কা ক, আর কু হু কু হু করে বলিয়া কোকিলের নাম কো কি ল, ইহা বুঝা যায়; এমন কি কেঁউ কেঁউ যে করে, সে কু কু র, ইহাও অনুমান চলে। এইরূপে কতকদূর যাওয়া চলে, কিন্তু বহুদূর যাওয়া চলে না।

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটাকে ইংরেজিতে পণ্ডিতের ভাষায় অনোম্যাটপিক থিয়োরি বলে। বিদ্রূপ করিয়া ইহাকে bow-wow theory বা ভেউ-ভেউ-বাদ বলা হয়। বলা বাহুল্য যে এই ভেউ-ভেউ-বাদের দৌড় খুব অধিক নহে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিন্তু ইহার দৌড় বোধ করি অন্য ভাষার চেয়ে অধিক। নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করেন নাই। প্রচলিত বাঙ্গালা কোষগ্রন্থে এই শ্রেণির শব্দের স্থান নাই, দয়া করিয়া দুই চারিটাকে স্থান দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু চলিত মৌখিক ভাষায় ইহাদের সংখ্যার সীমা পাওয়া যায় না।

আমাদের শাব্দিক পণ্ডিতদিগের নিকট এই শ্রেণির শব্দের আদর ন বটে, কিন্তু আমাদের কবিগণ ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারে নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে ভাষায় অধিকারে যাঁহার তুল মিলে না, বাগ্‌দেবতা যাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত হইয়া মধুবৃষ্টি করি গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্র এই শ্রেণির শব্দগুলির কেমন প্রচুর প্রয়ো করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শাব্দিক পণ্ডিতে *ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির* আলোচনায় অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু ভারত চন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেন না। অন্নদামঙ্গলের 'দ ল মল দ ল মল গলে মুণ্ডমালা' এবং "ফ না ফ ন ফ না ফ ন ফণীফন্ন গাজে প্রভৃতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইবে না।

এই অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দগুলির বিশিষ্টতা এই যে উহাদের অধিকাংশ শব্দই দেশজ শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় উহাদের মূল খুজিয়া পাওয় যায় না। দেশজ বলিয়া উহাদের গায়ে অনার্য্য গন্ধ আছে; এ দেশের শাব্দিক পণ্ডিতেরা, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচন করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই গন্ধ সহিতে পারেন না। তাঁহার সহিতে না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধা আর্য্যা সংস্কৃত-ভাষা ঠাকুরাণী যে কালক্রমে এই শ্রেণির বহু শব্দকে হজম করিয়া লইয়াছেন, তাহা যে কোন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ খুলিলেই দেখা যাইবে এবং বৈদিক আর্ষ সংস্কৃতের সহিত আধুনিক লৌকিক সংস্কৃতের তুলনা করিলেও তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। সংস্কৃত কবিগণ যে ইহাদিগকে কাব্যের ভাষায় স্থান দিতে সঙ্কোচ করেন নাই, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের মত বাঙ্গালী কবির এই শ্রেণির শব্দের প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল, তাহা ত জানাই আছে। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেও এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "থটমট থটমট খুরোত্থধ্বনিকৃত" ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা

যাইতে পারে। মহাকবি ভবভূতি, বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষার প্রয়োগে যাঁহার সমকক্ষ কবি সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল, তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাঁহার কবিতাকে সাজাইতে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'ভবভূতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে।

সাহিত্যের ভাষার পক্ষে যাহাই হউক, চলিত ভাষায় এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালীর কথা কহা একেবারে বন্ধ করিতে হয়। আমাদের কাজকর্ম্ম ঘরকরনা অচল হয়। অন্ততঃ এই জন্যও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় এই শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ সপ্তম বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির একটা বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন; তৎপূর্ব্বে বোধ করি আর কেহ সেই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষ্য করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিব। কাকে কা কা করে, আর কোকিলে কু হু কু হু করে, গাড়ী ঘ র ঘ র করিয়া চলে, আর মানুষে খু ক খু ক করিয়া কাশে; এই সকল দৃষ্টান্তে নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। আমরা হি হি করিয়া হাসি, আর খ ট খ ট করিয়া চলি, এখানেও স্বভাবের অনুকরণ। কিন্তু রাগে যখন গা গ শ গ শ করে, তখন কি বাস্তবিকই গা হইতে এইরূপ ধ্বনি বাহির হয়? যখন গ ট ম ট করিয়া তাকান যায়, তখন চোখ হইতে বড় জোর একটা জ্যোতি বাহির হয়, কোনরূপ গ ট ম ট শব্দ ত বাহির হয় না। শীতে যখন হাত পা ক ন্ ক ন্ করে, তখন মাইক্রোফন লাগাইলেও সেই ধ্বনি শোনা যায় না। বুকের ভিতরের দু র দু র নি বা ধু ক ধু ক নি ষ্টেথস্কোপ লাগাইলে কর্ণগোচর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাঙা টু ক্ টু কে কাপড় হইতে কোনরূপ

টু ক টু ক শব্দ আবিষ্কারের কোন আশা দেখি না। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির ধারা কখন ঝিম ঝিম, কখন ঝম ঝম, কখন বা ঝপ ঝপ শব্দ করে, তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঝিক্ ঝিকে বেলায় যখন অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণ তাল গাছের মাথাকে রঞ্জিত করে, তখন কোনরূপ ঝিক ঝিক শব্দ শুনি নাই। আঁধার ঘরে চ ক চ ক শব্দে বিড়ালকর্তৃক দুধের বাটির দুগ্ধপানবার্ত্তা ঘোষিত হয় বটে, কিন্তু চ ক চ কে দুয়ানিকে কখন চ ক চ ক শব্দ করিতে শুনি নাই। এই শব্দগুলি নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু কোনরূপ ধ্বনি ত কখনও কর্ণগোচর হয় না। আপাততঃ ঐ সকল ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বনিজাত শব্দের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না, অথচ উহারা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে অর্থ ব্যঞ্জনা করে! ক ন্ ক নে শীত বলিলে যেমন শীতের তীব্রতা বুঝায়, চ ক্ চ কে দুয়ানি বলিলে যেমন দুয়ানির ঔজ্জ্বল্য বুঝায়, রাঙা-টু ক্ টু কে বলিলে সেই রাঙার তীক্ষ্ণতা যেমন চোখের উপর ঠিকরিয়া পড়ে, আর কোন বিশেষণ তেমন স্পষ্টভাবে সেই সেই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। চ ক্ চ কে শব্দটির অন্তর্গত তালব্য বর্ণ 'চ' আর কণ্ঠ্যবর্ণ 'ক', এই দুই বর্ণের ধ্বনিতে এমন কি আছে, যাহাতে চ ক্ চ কে জিনিষের চা ক্ চি ক্য বা উজ্জ্বলতা বুঝাইয়া দেয়? উজ্জ্বল জিনিষ হইতে যদি বস্তুতই কোনরূপে চ ক চ ক ধ্বনি বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ঔজ্জ্বল্যের সহিত চাকচিক্যের সম্পর্ক বুঝিতাম। কিন্তু সেরূপ ত কিছুই শুনি না। ঔজ্জ্বল্য দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, আর চকচকানি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়; উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হইল কি সূত্রে? রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং একদিক্ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছিলেন। অন্যদিক্ হইতে এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইচারিটা কথা বলা আবশ্যক।

বাঁশীতে ফুঁ দিলে তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় ও সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা আনন্দ পাই। কোন কোন ধ্বনি শুনিলেই আনন্দ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশী বাজাইতেন, আর গোপীরা জ্ঞানহারা হইয়া সেই দিকে ছুটিত। ধ্বনির সহিত এই আনন্দের বা উন্মাদনার এইরূপ সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহার উত্তর কোন পণ্ডিতে দিতে পারেন না। তবে কোন কোন ধ্বনির সহিত আনন্দের সম্পর্ক আছে, ইহা ঠিক্। নতুবা সঙ্গীতবিদ্যাটাই অযথার্থ হইত। কেবল আনন্দের কেন, ক্লেশেরও সম্পর্ক আছে। কোন কোন ধ্বনি যেমন আনন্দ দেয়, কোন কোন ধ্বনি তেমনি ক্লেশের হেতু;—যেমন ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট হয়। কোন্ ধ্বনি চিত্তে কোন্ ভাব কিরূপে জাগায় বা কেন জাগায়, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহা বলিতে পারেন না, তবে কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি মধুর হইবে, আর কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি কর্কশ হইবে, তাহার মোটামুটি একটা হিসাব দিতে পারেন। বাঁশী বাজাইলে বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাঁপিয়া উঠে এবং ভিতরের কম্প বাহিরে আসিয়া বাহিরে বায়ুরাশিতে ঢেউ জন্মায়। সেই ঢেউগুলি কাণে আসিয়া ধাক্কা দেয় ও সেখানকার স্নায়ুযন্ত্রে পুনঃপুনঃ আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনির বোধ হয়। সেকণ্ডে কতগুলি ঢেউ আসিয়া কাণে আঘাত দেয়, তাহার সংখ্যা করা চলে। সংখ্যা গণিয়া দেখা গিয়াছে, সেকণ্ডে দু'শ পাঁচ শ দু'হাজার দশ হাজার বাতাসের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে ধ্বনি জ্ঞান জন্মে। সেকণ্ডে দু' দশটা মাত্র ঢেউ কাণে লাগিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না, আবার সেকণ্ডে লাখ খানেক ঢেউ লাগিলেও ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না। ঢেউয়ের সংখ্যাভেদে ধ্বনি কোমল বা তীব্র হয়। সেকণ্ডে পাঁচ-শ ঢেউ কাণে লাগিলে যে ধ্বনি শোনা যায়, হাজার ঢেউ লাগিলে ধ্বনি তার চেয়ে তীব্র হয়; স্বরটা একগ্রাম উচুতে উঠে। প্রতি সেকণ্ডে আঘাতের সংখ্যা যত বাড়ে, ধ্বনি ততই উচুতে—কড়িতে—উঠে, আর সংখ্যা যত কমে, ততই কোমল হয়।

বাঁশীর ভিতর যে ঢেউগুলি জন্মে, উহারা কোথাও কোন বাধা না পাইয়া বাহিরে আসে ও বাহিরের বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হয়। যতক্ষণ ব্যাপিয়া এই ঢেউগুলি আটক না পাইয়া বাহিরে আসিতে থাকে, ততক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা বংশীধ্বনি শুনিতে পাই।

তানপুরার তারে ঘা দিলেও ঐরূপ হয়। তারটা যতক্ষণ কাঁপে, চারিদিকের বায়ুরাশিতে ততক্ষণ ধাক্কার পর ধাক্কা লাগিয়া ঢেউ জন্মে ও ততক্ষণ ধরিয়া আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই। লম্বা তারে সেকেণ্ডে যতগুলি ঢেউ জন্মায়, খাট তারে তার চেয়ে অধিক জন্মায়। তন্ত্রী যত লম্বা হয়, ধ্বনি ততই নীচে নামে বা কোমল হয়।

এই সকল ধ্বনি মধুর ধ্বনি; মধুর বলিয়াই বাঁশী আর তন্ত্রী সঙ্গীতের যন্ত্রগঠনে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমাধুর্য্যের উৎকর্ষ সাধন করে। লম্বা তারে ঘা দিলে গোটা তারটাই কাঁপে; আবার গোটা তারটা আপনাকে দুই, তিন, চারি বা ততোধিক সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ পৃথক্ ভাবে কাঁপে। এক এক ভাগের কম্পে এক এক রকম ধ্বনি বাহির হয়। দুই হাত লম্বা ভাগে যে ধ্বনি বাহির হয়, একহাত লম্বা ভাগ হইতে তার চেয়ে উচু, আধহাত লম্বা ভাগ হইতে আরও উচু ধ্বনি বাহির হয়। এই সকল ধ্বনি একত্র মিশিয়া ধ্বনির মাধুর্য্যের ইতরবিশেষ জন্মায়। বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসেও ঐরূপ ঘটে। সমস্ত বাতাসটা কাঁপে; আবার ঐ বাতাস আপনাকে দুই তিন চারি সমান স্তরে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ আপন আপন ধ্বনি জন্মাইয়া কাঁপে। ইহার মধ্যে কোন ধ্বনি কোমল, অন্যটা তার চেয়ে তীব্র; কোমলে তীব্রে মিশ্রিত হইয়া ধ্বনির মাধুর্য্য বাড়াইয়া দেয়, অথবা ধ্বনির প্রকৃতি বদলাইয়া দেয়।

টেবিলের উপর কাঠে ঠক্ করিয়া ঠোকর দিলে কাঠখানা কাঁপিয়া উঠে; কাষ্ঠফলকটা আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া লয় ও প্রত্যেক

ভাগ আপন আপন ধ্বনি উৎপাদন করিয়া কাঁপিতে থাকে। কিন্তু বাঁশীর ভিতরের বাতাস বা তন্ত্রীযন্ত্রের তার যেমন আপনাকে সমান সমান ভাগ করিয়া লয়, কাষ্ঠফলক তেমন করিয়া বিভক্ত হয় না। উহার ভাগগুলি এলো-মেলো অনিয়ত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ভাগ হইতে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহারা একযোগে এমন একটা কর্কশ ধ্বনি উৎপাদন করে, যাহা কর্ণপীড়া জন্মায়। কাঠের ঠক্‌ঠকানি কাহারও মিষ্ট লাগে না। সুখের বিষয় যে উহার স্থিতিকাল অল্প। ঠক্ করিয়া ঠোকর দিবামাত্র কাঠখানা এখানে ওখানে সেখানে কাঁপিয়া উঠে এবং ক্ষণেকের মধ্যে থামিয়া যায়। তাই কর্ণপীড়াটাও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

পিতলের ঘড়িতে হাতুড়ির আঘাত দিলে ঢং করিয়া শব্দ হয়। ঐ 'ঢং' শব্দের 'ঢ' টুকুতে কোন মাধুর্য্য নাই। কঠিন ধাতুফলকে কাঠের হাতুড়ির আঘাতে যে এলোমেলো কাঁপুনি ক্ষণেকের মত জন্মে, এই কর্ণজ্বালাকর 'ঢ'টা তাহারই ফল। তবে এই এলোমেলো অনিয়মিত কম্প থামিয়া গেলে ধাতুফলকটা আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া বেশ নিয়মিত ভাবে কাঁপিতে থাকে; তখন 'ঢং' এর 'ঢ' টুকু চলিয়া গিয়াছে, উহার 'অং' টুকু তখনও চলিতেছে। এই ঢ-টুকু কর্কশ কিন্তু 'অং' টুকু বেশ মধুর।

শব্দশাস্ত্রে বলে, ঐ 'ঢং' শব্দটার মধ্যে দ্বিবিধ ধ্বনি আছে; একটা ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি, আর একটা স্বর বর্ণের ধ্বনি। 'ঢং' এর অন্তর্গত ক্ষণস্থায়ী 'ঢ' টুকু ব্যঞ্জন বর্ণ, আর স্থায়ী 'অং' টুকু স্বরবর্ণ। ঐ ব্যঞ্জনটুকু কর্কশ, আর স্বরটুকু মধুর। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ঐ অচিরস্থায়ী ব্যঞ্জনটার জন্ম; উহার স্থিতিকাল এত অল্প, যে পরবর্ত্তী 'অং' টুকু উহাতে যুক্ত না হইলে উহা শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। 'ঢ' বর্ণের ধ্বনিটা ঘড়ির পিঠে হাতুড়ির স্পর্শকালে উদ্ভূত হয়; ঐ স্পর্শকালেই উহার উৎপত্তি হয়; এইজন্য উহাকে স্পর্শ-বর্ণের ধ্বনি বলা যাইতে পারে।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র অনেকটা বাঁশীর মত। ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসের

বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পথে অবস্থিত পেশীনির্ম্মিত দুইটা তারে আঘাত দিয়া ঐ তার দুটাকে কাঁপাইয়া দেয় এবং সেই তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি শোনা যায়। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক না পাইয়া বাহির হইলে উহা স্বরবর্ণের ধ্বনির উৎপাদন করে; আর কোন স্থানে আটক পাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনির উৎপাদন করে। মুখ ব্যাদান করিয়া, মুখকোটর 'বিবৃত' করিয়া, আমরা স্বরবর্ণের উচ্চারণ করি, আর ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের সময় বহির্গমনোন্মুখ বায়ুকে, মুখকোটর হইতে বাহির হইবার সময়ে, কোন একটা স্থানে আটকাইয়া ফেলি। কণ্ঠতন্ত্রী কাঁপাইয়া কণ্ঠনালী হইতে বায়ু মুখকোটরে আসিতেছে; এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোঁড়াটাকে উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'ক'; উহা ব্যঞ্জনবর্ণ; জিহ্বামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি, কাজেই উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শ বর্ণ। জিহ্বার মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ করিয়া বাতাস আটকাইলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'চ'; উহা তালব্য স্পর্শ বর্ণ। জিহ্বার ডগাটা উলটাইয়া উপরে তুলিয়া তালুর পশ্চাতে যেখানটাকে মূর্দ্ধা বলে, সেইখানে এক ঠোকর দিলাম, আর ধ্বনি হইল 'ট'; উহা মূর্দ্ধন্য স্পর্শবর্ণ। জিহ্বার অগ্রভাগ উপর পাটির দাঁতে ঠেকাইয়া বাতাসটা আটকাইবামাত্র ধ্বনি জন্মিল 'ত'; উহা দন্ত্য স্পর্শ বর্ণ। আর দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িয়া দিলাম; অমনি ধ্বনি জন্মিল 'প'; উহা ওষ্ঠ্য স্পর্শবর্ণ।

নরকণ্ঠে যে যে ধ্বনি নির্গত হয়, নরকণ্ঠ ব্যতীত অন্যত্রও তৎসদৃশ ধ্বনি জন্মিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরকণ্ঠ অনেকটা বাঁশীর মত; বাঁশীর ভিতর হইতে বায়ু অব্যাহত ভাবে অর্থাৎ কোথাও আটক না পাইয়া বাহির হইলে যে ধ্বনি জন্মে, উহা স্বরের ধ্বনি; এই ধ্বনিকে যতক্ষণ

ইচ্ছা রাখিতে পারা যায়। সেই বায়ুর পথ রোধ করিলে ক্ষণস্থায়ী ব্যঞ্জনের উৎপত্তি হয়। কঠিন বস্তুর পরস্পর স্পর্শ বা সংঘট্ট এই ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপাদনের অনুকূল। যথা, কঠিন ইস্পাতে নির্ম্মিত কাঁচি দিয়া কঠিন ধাতু নির্ম্মিত তার কাটিলে শব্দ হয় 'ক ট'; কাঠে কাঠে আঘাতে শব্দ হয় 'ঠ ক'; পথের উপর পদ শব্দ 'দ প' ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন ধ্বনির বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে উহা ক্ষণস্থায়ী; এত অল্প সময় ব্যাপিয়া উহার স্থিতি, যে পূর্ব্বে বা পরে স্বরধ্বনি না থাকিলে উহার উচ্চারণ চলে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘড়ি পিটিলে যে 'ঢং' শব্দ হয়, উহার 'ঢ' টুকু ক্ষণস্থায়ী; ঢয়ের পরবর্ত্তী স্বর 'অং' টকু ঢ'য়ের বিরামের পর বহুক্ষণ থাকিয়া ক্রমশঃ থামিয়া যায়। আমরা কা, কি, কু, ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারি; আবার অক্, ইক্, উক্, এইরূপে আদিতে স্বর বসাইয়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিতে পারি; কিন্তু স্বরবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্যঞ্জনটুকু উচ্চারণ করিতে পারি না। হাওয়া কণ্ঠনালী হইতে মুখকোটরে বাহির হইবার সময় যদি কোনরূপ বাধা পায়, সেই বাধার সমকালে বাহির হয় ব্যঞ্জনের ধ্বনি; বাধাটা সরিয়া গেলে যাহা বাহিরে আসে, তাহা স্বর। ব্যঞ্জনের ধ্বনি ক্ষণিক ও কর্কশ; স্বরের ধ্বনি স্থায়ী ও মধুর। যাবতীয় সঙ্গীতের কারবার এই স্বরের ধ্বনি লইয়া; ব্যঞ্জন কেবল থাকিয়া থাকিয়া ঠোকর দেয় ও বিরাম দিয়া তাল রক্ষা করে।

খাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে বা 'বিবৃত' থাকে। হাওয়া অবাধে বাহির হয়। তবে মুখকোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের নানারূপ বিকার উপস্থিত হয়। 'আ' উচ্চারণের সময় আমরা একবারে বদন ব্যাদান করিয়া হা করিয়া থাকি; তখন জিহ্বাটা মুখ-গহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্ত্তী হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া

পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখ কোটর আরও ছোট হয়; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে; দুই ঠোঁটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয়; ঐ বিবরের দুয়ার দিয়া হাওয়া বাহির হয়। মুখকোটরের আকৃতির ভেদানুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হয়। বাঁশীতে যেমন একটা মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া মূল ধ্বনিকে বিকৃত করে, সেইরূপ মুখকোটরেও কণ্ঠোদ্গত মূল ধ্বনির সহকারে অন্যান্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিলিয়া মিশিয়া মূল ধ্বনির এইরূপ বিকার উৎপাদন করে। একই আ বিকৃত হইয়া ঈ' তে বা উ' তে পরিণত হয়।

প্রকৃত পক্ষে অ ই উ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের ধ্বনি একই মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য উচ্চতর ধ্বনির সংযোগে উৎপন্ন; উহারা একই মূল ধ্বনির বিবিধ বিকার মাত্র। কোন্ কোন্ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোলৎজ্ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের মধ্যে কোন্‌টার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি নানাবিধ স্বর যন্ত্রযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য। শব্দ শাস্ত্রে এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের খোঁজ লওয়া দরকার হয় না। এখানে মোটা আলোচনা চলে। এই মোটা আলোচনায় দেখা যায় যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটি স্বর আছে। 'অ' 'ই' 'উ'; এই তিন স্বরের প্রত্যেকের আবার মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই তিনটি করিয়া রূপ আছে। উচ্চারণের স্থিতিকালানুসারে মাত্রার নির্ণয় হয়। কালানুসারে এক মাত্রায় হ্রস্ব, দুই মাত্রায় দীর্ঘ, তিন বা ততোধিক মাত্রায় প্লুত।

এইরূপে ঐ তিন স্বরের নয়টি রূপ; যথা—অ, আ, আ; ই, ঈ, ঈ; উ, ঊ ঊ। প্লুতত্ব নির্দ্দেশের জন্য আমরা নীচে একটা কষি দিলাম।

এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটি করিয়া ভেদ আছে; নাক দিয়া কতক হাওয়া বাহির করিয়া প্রত্যেক স্বর আমরা নাকি সুরে উচ্চারণ করিতে পারি; যথা—অঁ (অং); অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া বাহির করিতে পারি; যথা—অঃ। এই দুই ভেদ 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' এই দুই লিপি চিহ্নদ্বারা লিখিয়া দেখান হয়। 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে; উহা স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি সাধন করে মাত্র। উল্লিখিত নয়টি স্বরের প্রত্যেকটিরই এই ত্রিবিধ বিকার হইতে পারে; যথা—অ অঁ অঃ; আ আঁ আঃ; আ আঁ আঃ। এইরূপে সমুদয়ে সাতাইশটি স্বর উৎপন্ন হয়। এই সাতাইশটি স্বরধ্বনি (অ, ই, উ) তিনটি মূল ধ্বনিরই রূপভেদ মাত্র।

আমরা সংস্কৃতভাষায় লিপি বাঙ্গলাভাষার জন্য গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বর্ণগুলির পুরাতন উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। 'অ'কারের উচ্চারণ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে; উহার প্রকৃত উচ্চারণ হ্রস্ব 'আ'। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে অকারের প্রাচীন বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়ত এখনও আছে। একটি বিহারী পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠের সময় পড়িতেছিলেন 'মম'; আমার ভ্রম হইয়াছিল, তিনি যেন পড়িতেছেন 'মামা'। হয়ত অকারের এই বিকৃত উচ্চারণ বহুকাল হইতেই চলিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থেও অকারের বিবৃত ও সংবৃত দ্বিবিধ উচ্চারণের কথা রহিয়াছে। সংবৃত উচ্চারণটা বোধ হয় বাঙ্গালার উচ্চারণেরই অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত বহুস্থলে আমরা অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব 'ও'কারের মত করিয়া লইয়াছি। কথাবার্ত্তার ভাষায় আমরা কোন স্বরেরই হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করি না; খাঁটি বাঙলায় 'ঈ', 'ঊ' রাখিবার প্রয়োজন আছে কি না, সন্দেহ। আবার বাঙলায় প্লুত উচ্চারণ নাই, এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। দূর হইতে 'রাম' 'হরি' প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিবার সময় রামের 'রা'য়ের

আকার ও হরির 'রি'য়ের ইকার তিনমাত্রা ছাড়াইয়া যায়। এই সকল স্থলে উচ্চারণ প্লুত উচ্চারণ।

'অ' 'ই' 'উ' ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে সন্ধ্যক্ষর কয়টি উৎপন্ন হয়; যথা—

অ+ই=এ; অ+এ=ঐ

অ+উ=ও; অ+ও=ঔ

পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্র এই চারিটি বর্ণের মধ্যে 'এ' এবং 'ও'কে, অন্ততঃ তাহাদের বাঙ্গালায় প্রচলিত উচ্চারণকে, সন্ধ্যক্ষর বলিতে চাহিবেন না। শব্দশাস্ত্রে সন্ধ্যক্ষর বলিলে হানি নাই। সংস্কৃত ভাষায় এই চারিটি স্বর স্বভাবতঃ দীর্ঘ; উহাদের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় একারের এবং ওকারের হ্রস্ব উচ্চারণই প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালীর মুখে ইকার ও উকার অতি অল্পেই একার ও ওকারে পরিণত হয়; যথা মিটান,—মেটান; মিশান—মেশান, শুনা—শোনা; বুঝা—বোঝা। হইবারই কথা—সংস্কৃতেও ইকারের গুণে একার এবং উকারের গুণে ওকার প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার একারের একটা ট্যারচা উচ্চারণ আছে—উপযুক্ত চিহ্নের অভাবে তাহা লিখিয়া দেখান দুষ্কর। এইখানেই তাহার পরিচয় আছে—'একটা' ও 'ট্যারচা' এই দুই শব্দেই পরিচয় আছে। এই পরিচয় কিরূপে দেখাব না 'দ্যাখাব', তাহা জানি না।

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় 'ঋ' ও 'ঌ' এই দুইটি বর্ণ স্থান পায়। উহারা স্বরবর্ণমধ্যে গণিত হইলেও খাঁটি স্বর নহে। 'ঋ উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় মূর্দ্ধা স্পর্শ করে; 'ঌ' উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় উপর পাটীর দাঁত স্পর্শ করে। প্রায় করে,—একটু ফাঁক থাকিয়া যায়; হাওয়া সেই ফাঁক দিয়া বাহিরে আসে। হাওয়াটা একবারে আটকায় না বলিয়া উহাদিগকে ব্যঞ্জন মধ্যে না ফেলিয়া স্বরের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষায় ঋকারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় প্রয়োগই আছে; তবে দীর্ঘ প্রয়োগের

দৃষ্টান্ত অধিক নাই। ঌকারের দীর্ঘ প্রয়োগ দেখা যায় না। দীর্ঘ ঌকারকে কেবল symmetry রাখিবার, অনুরোধে বর্ণমালায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।

'ক' 'চ' 'ট' ত 'প' এই স্পর্শ বর্ণ কয়টি মুখকোটরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শের ফলে উচ্চারিত হয়, দেখা গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের আবার রূপভেদ আছে। স্পর্শের সময় একটু বেশী চাপ দিলে হাওয়াও একট জোরে বাহির হয়; তখন 'ক' পরিণত হয় 'খ'য়ে; 'চ' পরিণত হয় ছ'য়ে। ঐরূপ ট, ত এবং প যথাক্রমে ঠ, থ এবং ফ'য়ে পরিণত হয়। ক চ ট ত প এই পাঁচটি বর্ণ অল্পপ্রাণ; আর খ ছ ঠ থ ফ এই পাঁচটি মহাপ্রাণ। প্রাণ শব্দের অর্থ হাওয়া; হাওয়া জোরে বাহির হয় বলিয়া নাম হইয়াছে মহাপ্রাণ। আবার হাওয়ার পরিমাণটা বেশী হইলে, প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ আরও গম্‌গমে জম্‌জমে গম্ভীর হইয়া পড়ে; তখন ক চ ট ত প যথাক্রমে গ জ ড দ ব' য়ে পরিণত হয়। ধ্বনির এই গাম্ভীর্য্যের পারিভাষিক নাম 'ঘোষ'; 'ক'য়ে ঘোষ নাই; কিন্তু গ'য়ে ঘোষ আছে। ঐরূপ চ'য়ে ঘোষ নাই; কিন্তু জ' য়ে ঘোষ আছে। ঐরূপ গ জ ড দ ব আবার জোরে উচ্চারণে ঘ ঝ ঢ ধ ভ এই পাঁচ বর্ণে পরিণত হয়। গ জ ড দ ব অল্প-প্রাণ; তাহাদের তুলনায় ঘ ঝ ঢ ধ ভ মহাপ্রাণ। ক ও খ উভয়েই ঘোষহীন; উহার মধ্যে আবার ক অল্পপ্রাণ, খ মহাপ্রাণ। গ ও ঘ ঘোষবান্; উহার মধ্যে গ অল্পপ্রাণ, ঘ মহাপ্রাণ। এইরূপে প্রাণের ও ঘোষের তারতম্যে ক বর্ণ 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' এই চারি রূপ গ্রহণ করে; আর উচ্চারণকালে নাক দিয়া কতক হাওয়া আসিলে উহার অনুনাসিক রূপ হয় ঙ। কাজেই জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ ক বর্গের অন্তর্গত পাঁচটি বর্ণ ক, খ, গ, ঘ, ঙ। ঐরূপ তালব্য চ বর্গের অন্তর্গত চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; মূর্দ্ধন্য ট বর্গের অন্তর্গত ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; দন্ত্য ত বর্গের অন্তর্গত ত, থ, দ, ধ, ন। আমাদের বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি এইরূপে সাজান যাইতে পারে :—

স্পর্শবর্ণ

	ঘোষহীন		ঘোষবান্		অনুনাসিক		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ		সন্ধ্যক্ষর	উষ্ম
জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	—	—
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য়	শ
মূর্দ্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	ব	—

ছেলেদিগকে ক খ শেখাইবার সময় আমরা 'ঙ'কে 'উঙা' বা 'ওঙা' এবং 'ঞ'কে 'ইঞা' বলিতে শিখাই; উহাদের উচ্চারণ কেন এরূপে বিকৃত করা হয়, জানি না। আদিতে স্বর না বসাইয়া অন্তে অকার বসাইয়াও এই দুই বর্ণের উচ্চারণ চলে। উহাদের অকারান্ত উচ্চারণ না করিয়া আকারান্ত করিবারও প্রয়োজন দেখি না। বাঙ্গলা ভাষায় 'ণ'য়ের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু উহা সর্ব্বত্র লুপ্ত হয় নাই। কণ্টক 'কণ্ঠ' 'অণ্ড' 'ঢুণ্টি' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় ণকারের প্রকৃত মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে।

সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তিম বর্ণ 'হ', ইহাকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা চলে। 'অ' যেন মহাপ্রাণ হইয়া 'হ'য়ে পরিণত হয়। ইংরেজিতে hএর উচ্চারণ হ; ইংরেজি লিপি দ্বারা কোন বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ দেখান আবশ্যক হইলে অল্পপ্রাণ বর্ণের চিহ্নে h যোগ করা বিধি আছে। যথা—k = ক, kh = খ।

'য়' (y) 'ব' (w) 'র' 'ল' এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণকে উলটা রকমের সন্ধ্যক্ষর রূপে গণ্য করা চলিতে পারে।

য়=ই+অ	ব=উ+অ
র=ঋ+অ	ল=ঌ+অ

উহাদের উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃতও থাকে না, আবার হাওয়া একবারে আটকানও পড়ে না। কাজেই উহারা না-স্বর না-ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে y ও w পদমধ্যবর্ত্তী হইলে vowel বলিয়াই গণ্য হয়।

'ড' এবং 'ঢ'য়ের বিকার 'ড়' এবং 'ঢ়' কে আমরা এই অন্তঃস্থ পর্য্যায়ে রাখিতে পারি।

সংস্কৃত অন্তঃস্থ য ও অন্তঃস্থ ব বাঙ্গালায় আসিয়া উচ্চারণে বর্গীয় জ ও বর্গীয় ব'য়ের তুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঐক্য বাক্য নাট্য, দ্বার দ্বারকা ত্বরা, প্রভৃতি শব্দে যুক্তবর্ণে বিশুদ্ধ অন্তঃস্থ উচ্চারণ পাওয়া যায়।

শ, ষ, স, এই তিনটি বর্ণ আছে; জিহ্বা ঘেঁষিয়া বায়ু বাহির হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে এই এই ধ্বনি জন্মে; ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ। যাঁহারা বলেন, বাঙলায় তিনটি উষ্মবর্ণের প্রয়োজন নাই, এক 'শ'য়েই কাজ চলিতে পারে, তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য নহে। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে আমরা উষ্ম বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করিয়াছি, না রাখিয়া উপায় নাই। অবধান করিলেই বুঝা যাইবে। যথা—নিশ্চয়, পশ্চাৎ, এস্থলে তালব্য উচ্চারণ; কষ্ট, ওষ্ঠ, এস্থলে মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ; হস্ত, মস্তক, এস্থলে দন্ত্য উচ্চারণ। ইংরেজি z এর উচ্চারণ তালব্য উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ; বাঙ্গালায় ঐ উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত চিহ্ন নাই।

নরকণ্ঠনিঃসৃত যে সকল ধ্বনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি মোটামুটি দেখান গেল। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল ধ্বনি আছে, অন্যান্য ভাষাতেও তাহার অনেকগুলি আছে; কোথাও গোটাকতক কম, কোথাও বা গোটাকতক বেশী আছে মাত্র। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান হইয়াছে, অন্য কোন ভাষার বর্ণমালা সেরূপ সাজান হয় নাই। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় ঐ

বর্ণমালাই গ্রহণ করিয়াছি, তবে সকল বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ স্থির রাখিতে পারি নাই, এবং বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালার অতিরিক্ত দুই একটা ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার স্থান ঐ সংস্কৃত বর্ণমালায় নাই।

নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে মনুষ্যের ভাষার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। বাঙ্গলা ভাষার নির্ম্মাণকার্য্যে এই অনুকরণ কতদূর চলিয়াছে, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। কতিপয় ধ্বনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়। এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্থ আরোপ করা হয়। সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল? শব্দের গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কি না, তাহা দেখান আবশ্যক; তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কেন ঐ শব্দ ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা বাহুল্য যে অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শব্দশাস্ত্রের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য উপায় নাই।

প্রথমে আ ই উ এই স্বরত্রয়ের ভেদ কোথায় দেখা যাউক। 'আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তার যথাশক্তি বাড়াইয়া লই। 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের বিস্তার ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণে আরও ছোট হয়। আমি বলিতে চাহি যে ঠিক্ এই জন্যই law of association অনুসারে 'অ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায়; ই তার চেয়ে ছোট, উ আরও ছোট বুঝায়।

বাঙ্লায় টা, টি, টু, এই তিনটি প্রত্যয় আছে। যথা—একটা, একটি, একটু। একটা বলিলে যত বড় জিনিষ বুঝায়, একটি বলিলে তার চেয়ে ছোট বুঝায়, একটু বলিলে আরও ছোট, অর্থাৎ অতিঅল্পমাত্র, বুঝায়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন না কি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজা-টি নও, রাজা-টা; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-টা।"

চ ক চ কে বলিলে উজ্জ্বল দ্রব্য বুঝায়; চি ক্ চি কে দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য তার চেয়ে অল্প; চু ক্ চু কে দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বোধ করি আরও অল্প।

ক ড় ক ড়ে বলিলে কর্কশ বুঝায়; কি ড় কি ড়ে দ্রব্যের কার্কশ্য তার চেয়ে অল্প।

রাঙা ট ক্ ট কে রঙের তীব্রতার চেয়ে রাঙা টু ক্ টু কে রঙের তীব্রতা অল্প।

প ট্ প টে দ্রব্য হাল্কা ও ভঙ্গপ্রবণ; পি ট্ পি টে দ্রব্য আরও হাল্কা, পু ট্ পু টে দ্রব্য এত ভঙ্গুর, যে বোধ করি স্পর্শ সহিতে অক্ষম।

চ ন্ চ নে রৌদ্র চেয়ে চি ন্ চি নে রৌদ্রের দীপ্তি অল্প।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। এই কয়টি দৃষ্টান্তেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়াছে, আশা করি। অ, ই, উ এই তিন স্বর একই ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জ্ঞাপন করে, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। ঐ তিন স্বরের মধ্যে যেটির উচ্চারণ যত প্রযত্ন-সাপেক্ষ, যেটির উচ্চারণে মুখকোটরের পরিসর যত বড় করিতে হয়, মুখের হা যত বড় করিতে হয়, সেই স্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইয়া তত আধিক্য জ্ঞাপন করে। অ, ই, উ, এই তিন স্বরের এই অর্থভেদ পাঠক অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মনে রাখিবেন।

এখন ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লইয়া আলোচনা করিব। ক-বর্গ হইতে প-বর্গ পর্য্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন খাঁটি স্পর্শবর্ণ। ঐগুলির আলোচনা প্রথমে করিব। একটু উলটাইয়া লইব। ক-বর্গে আরম্ভ না করিয়া প-বর্গে আরম্ভ করিব ও ক-বর্গে শেষ করিব।

প-বর্গ

প ফ ব ভ এই চারিবর্ণের উচ্চারণে মুখকোটরের বায়ু দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া বাহির হয়। দুই ঠোঁট জোড়া হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে; বায়ু ঠোঁট দুইখানিকে ভিন্ন করিয়া তাহাদের মাঝে পথ করিয়া লইয়া জোরের সহিত বাহির হয়। শূন্যগর্ভ ফাঁপা দ্রব্যের কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই এই শ্রেণির ধ্বনি জন্মে।

বাঁশী বাজাইবার সময় দুই ঠোঁটের চাপ দিয়া মুখের বায়ু বাঁশীর ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয়; বাঁশীতে যে ধ্বনি বাহির হয়, তাহার অনুকরণে আমরা বলি পোঁ শব্দে বাঁশী বাজিল। আগুন জ্বালিবার জন্য আমরা এইরূপে ফুঁ দিয়া থাকি। মহাদেব গাল বাজাইতেন, তাঁহার মুখের বায়ু বাহির হইবার সময় ব ম্ ব ম্ শব্দ হইত; মহাদেবের শিঙা ভ ভ ম্ভ ম্ শব্দে বাজিত। এই কয়টি দৃষ্টান্তেই দেখিতেছি যে প বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাঁপা দ্রব্যের স্বাভাবিক ধ্বনির সম্পর্ক রহিয়াছে। বায়ুপূর্ণ দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে বাতাস বাহির হওয়ার সময় এইরূপ ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আরও দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বর্ণের বিচারে পাওয়া যাইবে।

প

হাঁসে প্যা ক্ প্যা ক্ শব্দ করে; উহার দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে ঐ শব্দে বাতাস বাহির হয়। পাঁক বা কর্দ্দমের ভিতর বায়ুর বুদ্বুদ আবদ্ধ থাকে; হাতে টিপিলে উহা বাহির হইয়া যায়; এই হেতু পাঁকের মত জিনিষ প্যা ক্ প্যা ক্ করে; উহা প্যা ক্ পেঁ কে। সংস্কৃত প ঙ্ক (বাঙ্গালা পাঁ ক) শব্দের সহিত এই ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি?

কীটের নাম পোকা হইল কেন? উহার অস্থিহীন প্যাকপেঁকে ফাঁপা শরীরের জন্য না কি?

হালকা ভঙ্গপ্রবণ কঠিন দ্রব্য ফাটিবার সময়ে বায়ু সেই ফাট দিয়া বাহির হইলে পট্ শব্দ হয়; উহার রূপান্তর পটাস ও পটাং। যাহা পট্ করিয়া ফাটে তাহা পটকা; পটকা ছোড়া হইতে পটকান। সংস্কৃতে পিটক ও পেটক শব্দ না থাকিলে বলিতাম, পেট, পেটরা প্রভৃতি শব্দও শূন্যগর্ভতার জ্ঞাপক। অন্ততঃ পোঁটলা পুঁটুলির ভিতরটা ফাঁপা বটে। পুঁটি মাছ ও পুটি খুঁকি কিজন্য ঐ নাম পাইয়াছে? পপ্পটী (সংস্কৃত) ও পাঁপড় (বাঙ্গলা) হালকা দ্রব্য। ফাটিবার শব্দ পট্‌পট্, পিট্‌পিট্, পুট্‌পুট্ ইত্যাদি; হালকা ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্যের বিশেষণ পটপটে, পিটপিটে, পুটপুটে। প'য়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ ট কাঠিন্যব্যঞ্জক [পরে দেখ]। কাপড় ছেঁড়ার শব্দ পড়পড়—উহা কর্কশ শব্দ; এখানে ড় কার্কশ্যবোধক।

মুখের ভিতর হইতে থুথু ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা বাতাসও বাহির হয়; পচ্ পিচ্ পিৎ থুথু ফেলার শব্দ। পিচ্ শব্দ সহকারে পিচকারি হইতে জল বাহির হয়। মুখ হইতে নিঃসৃত তাম্বুলরসের নাম পানের পিক। থুথুর মত যাহাতে ঘৃণা জন্মায়, তাহা পচ পচ করে, পিচপিচ করে, পিৎপিৎ করে, পল পল, পিলপিল, প্যালপ্যাল করে। পচা জিনিষ পচ পচ করে ও ঘৃণা জন্মায়; পোঁটা, পাচড়া ও পিচুটি ও ঐরূপ ঘৃণাকর। পচই মদ ভাত পচাইয়া প্রস্তুত হয়। পলু পোকা নিশ্চয় তাহার কোমল শরীর হইতে নাম পাইয়াছে। এই সকল শব্দে প'য়ের সহিত যুক্ত চ, ত, ল বর্ণগুলি তারল্যের ব্যঞ্জক

[পরে দেখ]। পনপনে, পিনপিনে, প্যানপেনে শূন্য-গর্ভ লঘুতার পরিচয় দেয়।

ফ

প'য়ের তুলনায় ফ-বর্ণ মহাপ্রাণ; ফ উচ্চারণে হাওয়া আর একটু জোরে বাহির হয়। শেয়ালে সময় অসময়ে ফেউ ডাকে; তজ্জন্যই কি শেয়ালের নাম ফেরু? আগুনে ফুঁ দেওয়া হয়; উহার সংস্কৃত নাম ফুৎকার। ফাঁপা জিনিষের ভিতর হইতে বাতাস বাহির হইলেই শব্দ হয় ফস্, ফিস্, ফুস্; ফ'য়ের পরবর্ত্তী উষ্মবর্ণ সকার বায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সাপের মুখের ভিতর হইতে বাহির হয় ফোঁস্। লোকে ফুসফাস করিয়া বা ফিসফিস করিয়া কথা কহে বা গোপনে পরামর্শ করে। গোপনভাবে কাণের কাছে ফুসফাস করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিপথে চালাইবার চেষ্টার নাম ফুসলান। বুকের ভিতর যে যন্ত্র হইতে শ্বাসবায়ু বাহির হয়, তাহার নাম ফুসফুস। যে জাদুবিদ্যা—ডাইনের বিদ্যা—জানে, সে ফুসফাস মন্ত্র পড়িয়া অন্যকে বশীভূত করে—সেই জাদুকরের নাম ফোকস।

ফিক্ ক'রে হাসিলে মুখের কিঞ্চিৎ বাতাস বাহিরে আসে। সে হাসি হো হো হাসি নয়; উহা মৃদু হাসি, হালকা হাসি। কোন রঙ যখন হালকা হয়, তখন তাহাকে ফিকে বলে; ফিকে রঙের গাঢ়তা নাই; অত্যন্ত ফিকে হইলে উহা প্রায় সাদাটে হইয়া ফ্যাকসা'তে পরিণত হয়।

ফাঁকের ভিতর বাতাস থাকে; ঐ ফাঁক শূন্যগর্ভ স্থান মাত্র। উহার নামান্তর ফোঁক ও ফোকর বা ফুকর। যে কাজের ভিতরে কিছু নাই, তাহা ফাঁকি, বা ফক্কিকারি, বা ফক্করি, বা ফোক্কা। যাহা ফাঁকি, তাহার ভিতর শূন্য; উহা মিথ্যা জিনিষ;

ভট্টাচার্য্যদের ন্যায়ের ফ াঁ কি ও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ফাঁকি দেওয়া যাহায় ব্যবসায়, সে ফি ঁ চে ল। বন্দুকে গুলি না ভরিয়া কেবল মিথ্যা আওয়াজ করিলে উহা ফ াঁ কা আওয়াজ হয়। ফুঁ দিয়া কাঁচের যে শূন্যগর্ভ শিশি তৈয়ার হয়, তাহা ফুঁ কো শিশি। ফু ক রি য়া ক্রন্দন অকারণে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন। গোয়ালার ফুঁ কো দেওয়া প্রসিদ্ধ।

মুখ হইতে জল ফেলানর বা থুথু ফেলানর শব্দ ফ চ্‌। যেখানে সেখানে মুখের জল ফেলা বা থুথু ফেলা সভ্যসমাজে গর্হিত ; ঐ কার্য্য তরল চিত্তের লক্ষণ ; লঘুপ্রকৃতি তরলচিত্ত লোকের চলিত বিশেষণ ফ চ্‌কে। গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ ভয় পাইয়া তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠে বা ফ চ্‌কি য়া উঠে। যে লঘুপ্রকৃতি শিশু কথায় কথায় কাঁদে, সে ফেঁ চ-কাঁদুনে।

যে সকল দ্রব্য শূন্যগর্ভ, ভিতরে বায়ুপূর্ণ, তাহা ফ াঁ পা; চামড়ার উপর ফো স্‌ কা পড়িলে উহা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের মত দেখায়; ছোট ফোস্‌কার নাম ফু স্‌ কু ড়ি বা ফু স্কু ড়ি। যাহা ফোস্‌কার মত ফাঁপা, তাহা ফ স্‌ কা; উহাকে চাপিয়া ধরিতে গেলে ফ স কি য়া যায়। ফু স্কু ড়ি র প্রকারভেদ ফো ড়া। ভুঁই-ফোড় মানুষ সহসা সমাজ ফু ড়ি য়া ফাঁপিয়া উঠে ও হয়ত ফো ড়া র মত যন্ত্রণা দেয়। ছুঁচে ফো ড় তুলিবার সময়ও ছুঁচ হঠাৎ এ পিঠ হইতে ও পিঠে ফুটিয়া আসে। নিতান্ত যাহা ফাঁকি, গ্রাম্য ভাষায় তাহা ফুঁ সি। ফোঁ পল, ফোঁ প ড়া, ফ্যাঁ প ড়া জিনিষ আকারে প্রকারে এই ফ াঁ পা ল শ্রেণির। প্রবল তুফানে নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিলে হয় ফ াঁ পি।

ফাঁপার প্রকারভেদ ফো লা; ভিতরে বাতাস ঢুকিয়া দ্রব্যকে ফুলাইয়া রাখে। যাহাকে বাতাসে ফুলাইয়া রাখে, তাহা ফু ল কো।

পুষ্পকোরক ফুলিয়া উঠিয়া ফুলে পরিণত হয়। ফুলকো, ফুলকি, ফুলুরি প্রভৃতির ভিতরটা ফোলা।

কঠিন পদার্থ,—যেমন কাঁচ, পাতর,—ফট্ শব্দ করিয়া ফাটে; মূর্দ্ধন্য ট-বর্ণ কাঠিন্যবোধক। ফাটা জিনিষের মাঝে যে ফাঁক থাকে, তাহা বায়ুপূর্ণ, উহার নাম ফাট ও ফাটাল। ছোট ফাটের নাম ফুটা; এখানে ফাটের আ-কার ফুটার উ-কারে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেয়। মাটির বাসন ফুট শব্দ করিয়া ফুটো হয়। গরম জল ফুট ফুট শব্দে বুদ্বুদ জন্মাইয়া ফুটিয়া থাকে। হাতের আঙুলে চাপ দিলে আঙুল ফুট করিয়া ফোটে। দুই হাতে ফাঁক করিয়া ধরিয়া খেলিবার তাস ফাঁটা যায়। ফুট কলাই ও ফুটি শসার ফাট অতি স্পষ্ট। ফিট বাবু ফুটফুটে গৌর বর্ণ ফিটফাট বেশবিন্যাস করেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরটা হালকা। প্রাচীরের মধ্যে বৃহৎ ফাটের বা দুয়ারের নাম কি ফটক?

জল ফুটিবার সময় যে জলকণিকা উদ্গত হয়, তাহা জলের ফোঁটা; সামান্যতঃ জল-কণিকামাত্রই জলের ফোঁটা। ভ্রাতৃললাটে ভগিনীদত্ত তিলকবিন্দু ভাই-ফোঁটা।

এক ফোঁটা জলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়া উহাকে ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া তোলে; জলবিন্দু বিস্তৃতি লাভ করে; অতএব বিস্তৃত জিনিষের নাম ফয়লা। কোন ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিলে তাহা হয় ফালাও কারবার। ঐরূপ কারবার অল্প স্থান হইতে অধিক স্থানে, নিকট হইতে দূরে, ছড়াইয়া পড়ে। নিকট হইতে দূরে ছড়ানর নাম ফেলা। যাহার দৃষ্টি দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অথচ তাহার ভিতরে কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, যাহা একরকম শূন্যগর্ভ দৃষ্টি, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়। ফাল্তো জিনিষ ফেলা ছড়ার জিনিষ। ফোতো কাজে মিছা সময় নষ্ট হয়। ফাটার প্রকারভেদ ফাঁসা—তেলের

কলসী ফাঁসিয়া গেলে তেল ছড়াইয়া পড়ে; তেলের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হইয়া ফাঁসার ফ'য়ের পরবর্তী উষ্মবর্ণ স ধ্বনির সৃষ্টি করে। কর্কশ কাঠকে ফাড়িয়া দ্বিখণ্ড করা চলে। কাপড়ের মত ফর ফরে বা ফুরফুরে জিনিষকেও ফাড়িয়া ছিঁড়িতে হয়।

মানুষ যখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়, তাহার ভিতরটা ফাঁকা হয়; তাহার মনের ভিতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি আসে না, ভিতরটা শূন্য হয়; তখন সে ফাঁ-ফরে পড়ে।

ফাঁদের ভিতরে পা দিলে পা আটকাইয়া যায়। ফন্দি-বাজ লোকে নানাবিধ ফাঁদ ফাঁদে।

ফষ্টি নষ্টি, ফটকি-নাটকি, ফুঁইফুটি প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দ এই শ্রেণিতে আসিবে।

গুম্ফ মধ্যে কেশগুলিকে বিছাইয়া ছড়ান অর্থে ফরকান। উহা একটা অহেতুক তেজস্বিতার আড়ম্বর। যাহার ভিতরে জোর নাই, যে বাহিরে ফুলিয়া তেজ দেখায়, সে ফরকায়।

হাওয়ার বেগে পাতলা কাপড় ফরফর করিয়া উড়ে; যে কাপড় যত পাতলা, বাতাসে তাহা তত ফাঁপিয়া উঠে; অধিক পাতলা হইলে সে কাপড় হয় ফুরফুরে। পাতলা কাপড় যেমন হাওয়ায় চঞ্চল, সেইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষও ফরফুরে। গণ্ডূষ-জলমাত্রেই চঞ্চল হইয়া শফরী ফরফরায়তে ইতি প্রসিদ্ধি।

জলবুদ্বুদের নামান্তর ফেনা; ফেনা শব্দটি কিন্তু সংস্কৃতমূলক। ফেনার মত যাহা দেখিতে, তাহা ফ্যানফেনে বা ফনফনে; উহার বাহিরটা জমকাল, ভিতরটা শূন্য। মিহি ধুতি যাহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু যাহা টান সহে না, যাহার জোর নাই, তাহা ফিন্‌ফিনে। বৃষ্টি অত্যন্ত মিহি ধারায় পড়িলে বলা যায় ফিন্‌ফিন্ বা ফাঁই ফুঁই বৃষ্টি পড়িতেছে।

ফের ফের যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মধ্যে কালগত ব্যবধান বা ফাঁক থাকে। যাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে, তাহাও ঐরূপ একটু ফাঁক দিয়া কিছুক্ষণ পরে আসে। ফিরি-ওয়ালা ফের ফের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া মাথায় ফেরি লইয়া বেড়ায়। ফিরতি প্রত্যাবর্ত্তনের মত প্রত্যাদানের নাম ফেরত দেওয়া।

আগুনের হালকা কণিকার নাম ফিনকুটি। ফানুসের ভিতরটাও ফাঁপা।

দেখা গেল এই সকল শব্দে একটা সাধারণ ভাব ব্যক্ত করে। বায়ুপূর্ণ, শূন্যগর্ভ, স্ফীতোদর, লঘু—এই ভাবটাই প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত প্র-স্ফুরিত, প্র-ফুল্ল, বি-স্ফারিত, স্ফীতি, স্ফোটন, ‘ফণ, ফেন প্রভৃতি শব্দগুলিতেও এই ভাব আছে। উল্লিখিত বাঙলা শব্দের মধ্যে কতকগুলি এই জাতীয় সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন, তাহা বলা বাহুল্য।

ব

প ও ফ'য়ে যে বায়ুর চলাচল দেখিয়াছি, ব'য়েও সেই বায়ুর চলাচল ব্যাপার আরও স্পষ্ট।

আমরা বিস্মিত হইয়া মুখের বাতাস জোরে বাহির করি ও বলি বাঃ; ইহার প্রকারভেদ বস্ ও বাস্; ইহা বিস্ময়সূচক ধ্বনি; বাঃ হইতে বাহবা। বাতাস যখন জোরে বহে, তখন বোঁ বোঁ শব্দ হয়; জোরে বাতাস ঠেলিয়া কোন জিনিষ ঘুরিতে থাকিলে বাতাসে বন্‌বন্ শব্দ হয়, জিনিষটা বন্ বন্ করিয়া ঘোরে। এই জন্যই কি বাতাসের নাম সংস্কৃত ভাষাতেও বায়ু? বোম আর বোমা (ইংরেজি bomb) স্পষ্টতই ধ্বনির অনুকরণজাত।

পায়রার মুখের শব্দ বক্‌বকম্। মানুষেও মুখের হাওয়া

প্রচুরপরিমাণে খরচ করিয়া ব কৃ ব কৃ করিয়া কথা কয় অর্থাৎ ব কে। ইহার সংস্কৃত রূপ বচন বা বাক্য। অধিক বকিলেই ব কা ব কি হয়। যে বেশী বকে, সে ব খা; কাজকর্ম্ম না করিয়া কেবল বাক্য-বাগীশ হইলে ব খি য়া যায়। যে নির্ব্বোধ যথাসময়ে বাক্য প্রয়োগ করিতে বা ব লি তে জানে না, সে বো কা। একেবারেই বকিতে না পারিলে সে হয় বো বা। অধিক কথা কহিলে বা জোরে কথা কহিলে ব কা হয়; আর যেমন তেমন কথা কহিলেই ব লা হয়। যাহা বলা যায়, তাহা বো ল বা বু লি; উহা কি সংস্কৃত বদ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে? রাঢ়দেশে ধর্ম্মঠাকুরের জাগরণ উপলক্ষে বো লা ন গান হয়। অতি নিকট-আত্মীয় পিতা ঠাকুরকে শিশু যখন মুখ ফুটিয়া প্রথম আধস্বরে সম্ভাষণ করে, তখন তাহাকে বা বা বলিয়া ডাকাই স্বাভাবিক; বাবার প্রকারভেদ বা বু ও বা পু। ব ক পাখীর নাম কি তাহার ডাক হইতে? বা বু ই পাখীর স্বর কিরূপ? বু ল বু ল পাখী মিষ্ট বুঁ লি বলে। বো ল তা উড়িবার সময় বোঁ বোঁ শব্দ হয়; উহা বাতাসে ডানা সঞ্চালনের শব্দ।

বকিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে বু ক বু ক নি হয়; ইহা অন্তঃকরণের একটা চাঞ্চল্য। কর্কশ বাক্য, যাহা কাণে বাজে, তাহা ব ড় ব ড় বা ব ড় র ব ড় র; উহা আরও নিম্নস্বরে অস্পষ্টভাবে হইলে বি ড় বি ড় বা বি ড়ি র বি ড়ি র হইয়া পড়ে। ব'য়ের পরবর্ত্তী বর্ণ ড় কার্কশ্যব্যঞ্জক।

বু চ কি, বো চ কা, বোঁ চা, বুঁ চো, ব চ কা নি প্রভৃতি শব্দ অন্য শ্রেণিতে আসিবে। সম্ভবতঃ উহারা পোঁটলা পুঁটলির মত শূন্যগর্ভতার ব্যঞ্জক।

ব র্ ব টি কলাই, বো ড়া কলাই, বো ড়া ধান, কি তাহাদের লঘুতার সহকারী কাঠিন্য ও কার্কশ্য হইতে নাম পাইয়াছে?

মূর্দ্ধন্য বর্ণ যেমন কার্কশ্য বুঝায়, তালব্য বর্ণ তেমনি তারল্য জ্ঞাপন করে। দৃষ্টান্ত—বজবজ, বজবজে, বিজবিজ, ব্যাজ-বেজে ইত্যাদি। বজবজে বিশেষণের প্রকারভেদ বদবদে। যে খাদ্যদ্রব্য বদবদ করে, তাহারই আস্বাদন বুঝি বোদা; উহাতে কোন রসের তীব্রতা বা ঝাঁঝ নাই।

ভ

ব'য়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ভ। জানোয়ারের মধ্যে ভেড়া ভ্যা ভ্যা করিয়া ভ্যাবায়; কুকুরে ভেউ ভেউ করিয়া ডাকে; মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে, মশা ভন্ভন্ করে; ভিমরুল ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ে; ভোমরা (সংস্কৃতে ভ্রমর) ভ্যানর ভ্যানর করিয়া উড়ে। যে বাদ্যযন্ত্রে ভ্যা ভ্যা করে, তাহা ভেরী। ছোট বাঁশীর নাম ঐ কারণে ভেঁপু।

জলমগ্ন কলসীর বাতাস জল ভেদ করিয়া ভক ভক, ভুক ভাক, ভুক ভুক, ভর ভর, ভুর ভুর, শব্দে বাহির হয়। বাতাস বাহির হইবার সময় যে বুদ্বুদ জন্মে, তাহার নাম ভুড়ভুড়ি; পত্রমধ্যে আবদ্ধ বায়ু সঞ্চরণের সময় ভট ভট ভুট ভাট শব্দ করে।

বাতাস ভেদ করিয়া কোন জিনিষ বেগে ঘুরিলে যেমন বন্ বন্ বা বোঁ বোঁ শব্দ হয়, সেইরূপ বাতাস ভেদ করিয়া বেগে দৌড়িলে ভোঁ দৌড় হয়। ফ'য়ের ধ্বনি যেমন শূন্যগর্ভতা বুঝায়, ভ'য়ের ধ্বনিতেও সেইরূপ শূন্যতার বা রিক্ততার ভাব আসে, যথা মনুষ্যহীন গৃহ ভাঁ ভোঁ বা ভোঁ ভাঁ করে। যাহার ভিতরে কিছুই নাই, তাহা ভূয়া; স্থূলকায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি, যাহার ভিতরে পদার্থ নাই, হয় ত একটা মোটা ভুঁড়ি আছে, তাহার বিশেষণ ভোমা; অন্তঃসারশূন্য লোকের বাহিরে আড়ম্বর ভিট্কেলি। উদ্দেশ্য-হীন মিথ্যা অনুকরণ ভেঙান বা ভেঙচান। অনাবশ্যক

মিথ্যা দুঃখের অভিনয় ভেবি। মিথ্যা প্ররোচনা ভুচুং। শস্যের ভিতরের সার বাহির করিয়া লইলে সারহীন ত্বক্ অবশিষ্ট থাকে, উহা ভুষি। লঘু অঙ্গারকণা ভুষা। মিথ্যা প্রতারণার নাম ভাঁড়ান। অন্তঃসারহীন আড়ম্বর প্রকাশের নামান্তর ভড়ঙ; যে জিনিষের ভড়ঙ আছে, তাহা ভড়কাল; ভড়ক দেখান অর্থে ভড়কান। বহু জনতার আড়ম্বর ভিড়। ভ্রান্ত মিথ্যা দৃষ্টির নাম ভেলকি। যে মানুষটার ভিতরে বুদ্ধির তেজ নাই, সে ভকুয়া। শূন্যগর্ভ বায়ুপূর্ণ জিনিষ হালকা; হালকা জিনিষ জলে ভাসে; যাহা ভাসে, তাহা অস্থির এবং চঞ্চল; ভাসা ভাসা কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। হালকা জিনিষ—যাহার ভিতরটা সচ্ছিদ্র ও বায়ুপূর্ণ—যেমন চিনির বাতাসা—উহা ভস্‌ভসে; উহা ভুস্ ভুস্ করিয়া সহজে ভাঙিয়া যায় বা গুঁড়া হয়। ঐরূপ জিনিষই ভসকা, ভুস্‌ভুসে বা ভুরভুরে। ইক্ষুরসজাত গুড় যখন ঐরূপ হালকা গুঁড়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা ভুরা। মনের ভিতরে স্মৃতি যখন লুপ্ত হইয়া মনকে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন ভুল হয়। ভুল করা যাহার স্বভাব, সে ভোলা। উদাসীন মহাদেবের ভোলা-নাথ নাম সার্থক।

ভ-বর্ণ মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্; উহাতে স্থূলতা জ্ঞাপন করে। ভোমা শব্দে এই স্থূলত্বের ভাব আসে দেখিয়াছি। ভোঁসার অর্থও মোটা অকর্ম্মণ্য মানুষ; ভাঁটা, ভোঁদা, ভ্যাদা, ভোঁদড়, ভদভদে প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ অর্থ সূচনা করে। ভুলকো তারা ঊষাকালের পূর্ব্বাকাশে উদিত শুকতারার গ্রাম্য নাম, নিশ্চয় ঐ তারার স্থূলত্বের ও উজ্জ্বলতার জ্ঞাপক। হাতিয়ারের ধার মোটা হইয়া ঐ হাতিয়ার অকর্ম্মণ্য হইলে ভোঁতা হয়। ভাঙড় ভাঙের নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকে।

শূন্যগর্ভ দ্রব্য স্থূলদ্রব্যে পূর্ণ হইলে ভ রি য়া উঠে বা ভ রা ট্* হয় বা ভ র পূর হয়। সোণারূপার মত স্থূল ভা রী জিনিষ ভ রি র ওজনে পরিমিত হয়।

ম

প হইতে ভ পর্য্যন্ত ধ্বনিতে আমরা বাতাসের খেলা দেখিয়াছি; ওষ্ঠ্যবর্ণের বিশিষ্টতাই এই বাতাসের খেলা লইয়া। কোন স্থানে বায়ুর নিষ্ক্রমণ কালে শব্দ হইতেছে, কোথাও বাতাস ঠেলিয়া চলিতে শব্দ হইতেছে, কোথাও বা বাতাস ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া রাখিতেছে। প-বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম'য়ের ধ্বনিতে এ ভাবটা আর তত প্রবল থাকে না; ম'য়ের অনুনাসিকত্বই প্রবল হইয়া প-বর্গের বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনুনাসিক বর্ণের বিশেষ লক্ষণ মৃদুতা সম্পাদন; উহা কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে মোলোয়েম করে।

ম-কারাদি কতিপয় শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে জাত। যথা, বাঁশের লাঠি ম চ্ করিয়া ভাঙে; ম চ শব্দে বাঁকানর নাম ম চ কা ন; মচ শব্দ খাট হইয়া মু চ হয়; ছোট কঞ্চি মু চ করিয়া ভাঙে। এইরূপ জিনিষ মু চ মু চে। মুচ্ শব্দ করিয়া মৃদুস্বরে হাসি মু চ কি য়া হাসি। ম চ কা ন র প্রকারভেদ মো চ ড়া ন। কোন জিনিষে পাক-লাগানর নাম মো চ ড় দেওয়া। মোচড়ানর রূপভেদ মো শ ড়া ন; প্রবল চাপে মু শ ড়ি য়া দেওয়া হয়; মানুষের আত্মা পর্য্যন্ত আকস্মিক বিপদের চাপে মু শ ড়ি য়া যায়।

বাঁশ চেয়ে কাঠ কঠিন জিনিষ; বাঁশ ম চ্ শব্দে ম চ কা য়; কাঠ ম ট্ শব্দে ম ট্ কা য়। তালব্য চ যোগে কোমলতা বুঝায়, আর মূর্দ্ধন্য ট যোগে কাঠিন্য বুঝায়। আঙুল ম ট্ কা ই লে ম ট্ ম ট্ শব্দ হয়; শব্দ তার চেয়ে মৃদু হইলে মু ট মু ট হয়। পুঁইশাকের ছোট ছোট ফলগুলিকে গ্রাম্যভাষায় পুঁই-মু ট মু টি বলে; উহা মু ট মু ট করিয়া ভাঙে।

কলাইশুটির ভিতরের বীজ ম ট র। যাহা ভাঙিলে ম টৃ শব্দ হয়, অর্থাৎ যাহা ভাঙিতে জোর লাগে, তাহা মো টা অর্থাৎ স্থূল। ম ট কা কাপড় কি মোটা কাপড় ? ম ট কি ঘৃত কিরূপ ? মোটা কাঠ মটমট শব্দে, কখন কখন আরও কর্কশ ম ড় ম ড় শব্দে, ভাঙে; হঠাৎ একটা প্রবল চাপে ভাঙিলে শব্দ হয় ম টা ং ও ম ড়া ং। বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমের বাছুরটিকে ম ড় ম ড়া য়ি ত করিয়াছিলেন। ম ড় ম ড়ে র চেয়ে ছোট মৃদু শব্দ মু ড় মু ড়; ছোট ছোট ভঙ্গপ্রবণ জিনিষ মু ড় মু ড় করিয়া ভাঙে বলিয়া মু ড় মু ড়ে হয়। মু ড় মু ড় শব্দে যাহা চিবান যায়, তাহা মু ড়ি; উহার প্রকারভেদ মু ড় কি। বনমধ্যে গাছের পাতা নড়িয়া কবি-প্রিয় ম র্ম র শব্দ জন্মায়।

ম ধ্বনির মৃদুতার পরিচয় অনেক জানোয়ারের ডাকে পাওয়া যায়; ভেড়ার ভ্যা ভ্যা শব্দ কর্কশ; ছাগলের ম্যা ম্যা শব্দ তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ ও মৃদু ও মোলাম। বিড়ালের ছানার মি উ মি উ শব্দ বড় মৃদু; বড় বিড়ালের গম্ভীর গলায় উহা ম্যা ও ম্যা ও হইয়া পড়ে। যাহার স্বভাব কোমল, সে যেন বিড়ালছানার মত মি উ মি উ করে; তাহাকে বলা যায় মি উ মি উ য়ে বা মি-মি য়ে বা মি ন মি নে। শুকনা মাটির চেয়ে ভিজা মাটি মোলাম; উহা ম্যা জ ম্যা জ করে; ভিজা মাটি ম্যা জ মে জে। মৃদুস্বভাব মানুষের বিশেষণ ম্যা দা। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যখন কোমল জ্যোতি বিস্তার করে, তখন উহা মি ট মি ট করে; মি ট মি ট করিয়া তাকাইবার সময় চক্ষু হইতে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়। নরম চামড়ার জুতা পায়ে চলিলে ম শ ম শ শব্দ হয়। কাপড়ের মধ্যে যাহা অত্যন্ত কোমল, তাহার নাম ম ল ম ল। এখানে তালব্য ল-কার অনুনাসিক ম-কারের মৃদুতা আরও বর্দ্ধন করিতেছে। আলো চক্ষুতে আঘাত করে; অন্ধকার কিন্তু চোখে আঘাত করে না, উহা কোমল জিনিষ; আলোক-

হীন কৃষ্ণবর্ণ মিশ মিশে কাল। মিশ মিশে কৃষ্ণবর্ণের জন্যই কি দাঁতের মিশি?

ত বর্গ—ত

প-বর্গ ছাড়িয়া ত-বর্গে আসিলে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এখানে বাতাসের কারবার নাই। কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে অথবা কোমলে কঠিনে আঘাতে ত-বর্গের ধ্বনির সৃষ্টি। মানুষের কোমল করতলদ্বয়ের পরস্পর আঘাতের শব্দ তাইতাই। শিশুর কোমল চরণতলে ভূমিস্পর্শ ঘটিলে তাইতাই শব্দের তালে তালে থেইথেই নৃত্য ঘটে। ভূতের পদশব্দ বোধ করি একটু গম্ভীর;—প্রমাণ, ভারতচন্দ্রের তা ধিয়া তা ধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে। কোমল দ্রব্য উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাতের শব্দ থপ্, দপ্, ধপ্। এই কোমল ভাব ত-বর্গের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

কোমল দন্ত্যবর্ণ তকারের উচ্চারণ যাহার কোমল জিহ্বায় ঠেকিয়া যায়, সে তোতলা। কোমল করতলের তালির শব্দ তাইতাই; যথা—তাইতাইতাই, মামার বাড়ি যাই। দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগের স্পর্শ-জাত শব্দ তুড়ি। কোমল জিনিষ তলতলে; আরও কোমল—তুলার মত কোমল—হইলে হয় তুলতুলে। তূলা শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত হইতে আসিলেও উহার মত কোমল দ্রব্য নাই। তুলির ডগাটাও তূলার মত কোমল। তরল জল কাণে ঢুকিলে তালা লাগে। কোন লঘু দ্রব্য সচ্ছিদ্র ও ভঙ্গপ্রবণ হইলে হয় তুসতুসে। কোমল দ্রব্যের চিক্কণ পৃষ্ঠদেশ তক্তকে—কোমল দ্রব্যে প্রতিফলিত হইয়া আলোটাও যেন কোমল হইয়া আসে। চিক্কণ জিনিষ নির্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন; সেই জন্য পরিচ্ছন্ন জিনিষ তরতরে।

কোমল জিনিষের অকস্মাৎ ভূপতনের শব্দ তক্; তাহাতে মৃদু

বিস্ময় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাক্ লাগে। বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চাহনির নাম তাকান। ছোট খাট মন্ত্র তন্ত্র—যাহাতে অল্পে কাজ উদ্ধার হয়, কাহারও বিশেষ ক্ষতি করে না,—তাহা তুক্‌তাক বা তুক্কা।

কোমল উজ্জ্বলতা হেতু তকতকে জিনিষ তকতক করে। উহা চকচকের সহিত তুলনীয়। উজ্জ্বল ধাতু পাত্রে রক্ষিত খাদ্য দ্রব্য তকিয়া গেলে উহার আস্বাদন সম্ভবতঃ জিহ্বাতে তক্ শব্দ জন্মায়।

ধাতুনির্ম্মিত তারে কোমল অঙ্গুলিসংঘাতে তুম্ তাম্ তানা নানা শব্দ হয়—তানা নানা সঙ্গীতের উপক্রমণিকা মাত্র, কেবল তানা নানা করিয়া সারিলে ফাঁকি দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ তাহার কোমল চরণপল্লবে ভূমিপৃষ্ঠ ঠেলিয়া এক একটা বৃহৎ লাফ দেয়—তড়াক্ তড়াক্ করিয়া। কবিকঙ্কণ মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাতের বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যাঙ-তড়কা পড়ে বাজ। তড়াক তড়াক্ বা তাড়াতাড়ি কাজের নাম তড় বড়, তিড়বিড় বা তিড়ির বিড়ির বা তিড়িং বিড়িং কাজ। তাড়াতাড়ি লাফালাফি করিয়া জীবনের কাজ সম্পাদন করিয়া গেলে জ্ঞানী লোকের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না; কেন না তুম তড়াক্কা ধুম ধরাক্কা সকলই হয় ফাক্কা।

থ

থ'য়েও সেই কোমলতা, তবে থ মহাপ্রাণ বলিয়া ত'য়ের তুলনায় ইহার ভার কিছু অধিক। কোমল ওষ্ঠদ্বয়ের আঘাতে থুথু ফেলা হয়; উহা হইতেই থুড়ি। বালকের কোমল পদশব্দ থই থই সহিত নাচের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। দাঁড়ান মানুষ হঠাৎ থপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে; উহার প্রকার ভেদ থপাস ও থপাং। মোটামানুষই থপ্ করিয়া বসে; কাজেই মোটা অক্ষম মানুষ থপথপে।

তলতলের মোটা থলথলে। তুসতুসের চেয়ে মোটা জিনিষ থুসথুসে। উহা আকারে ছোট; আকারে বড় হইলে হয় থসথসে।

পৃষ্ঠদেশে থাবার বা করতলপাতের শব্দ থাবড় বা থপ্পর। থাবড় শব্দে করাঘাত থাবড়ান। মুষ্ট্যাঘাতে বা শিলাঘাতে জিনিষ থেঁতলান হয়; মর্দ্দনপ্রয়োগে থাঁসা হয়।

কোমল বৃক্ষশাখা থরথর করিয়া কাঁপে; নরদেহও থর থর করিয়া বা থরহরি কাঁপিয়া থাকে। যে বৃদ্ধের শীর্ণদেহ হাওয়ায় কাঁপে, সে থুরথুরে বুড়ো।

কাঠ পাতরের মত কঠিন জিনিষ উপর হইতে বেগে মাটিতে পড়িয়া ঠক্ শব্দ করে ও পরে ঠিকুরিয়া অন্যত্র যায়; কিন্তু বিছানা বালিশ পুঁথি-পত্রের মত নরম থপথপে জিনিষ মাটিতে থপ্ করিয়া পড়িয়া থামিয়া যায় ও সেইখানেই থাকে। সংস্কৃত স্থা ধাতুর থ'য়ের সহিত এই থপ্ ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? তাহা হইলে থাকা, থোয়া, থির, থিত, থলি, থালি, থয়লা প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দও এই শ্রেণির মধ্যে আসিয়া পড়িবে। থামার সংস্কৃত মূল স্তম্ভ হইতে পারে, কিন্তু থম করিয়া থামে, এরূপ বর্ণনা চলিত। যাহা থামিয়া আছে, তাহা থমথমে। পুষ্করিণীর জল যখন থামিয়া থাকে, তখন উহা থমথম করে অথবা থই থই করে; বিরহী যক্ষের বাড়ীর পাশের দীঘির জল থই থই করিত। সরোবরের গভীর জলে থাই পাওয়া যায় না; উহা অ-থাই জল। থামথুম দিয়া আমরা অনেক জিনিষ থামাইয়া রাখি; এবং থাপথুপ বা থুপথাপ দিয়া গোপ্য বিষয় গোপনে স্থির রাখি। কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে চলন্ত ব্যক্তি থতমত হইয়া থামিয়া যায়। জঞ্জাল একত্র জড় হইয়া থক্ থক্ করে; উহা আবর্জ্জনায় পরিণত হইলে থিক্‌থিক্ করে।

দ

ত, থ ধ্বনি ঘোষহীন, কিন্তু দ'য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে; উহা গম্ভীর, জমকাল। দামামা, দগড় এবং (সংস্কৃত) দুন্দুভির বাদ্যেই তাহার পরিচয়। দুরমুশের শব্দও বোধ করি ঐ প্রকৃতির। থপ্ করিয়া পড়া ও থুপ করিয়া পড়ার সহিত দপ করিয়া পড়া ও দুপ করিয়া পড়ার তুলনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। মেজের উপর যে জিনিষ পড়িলে থুপ করে, ছাদের উপর তাহা পড়িলে দুপ করে; ছাদের নীচে ঘরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ বায়ুরাশি ধ্বনিত হইয়া শব্দটাকে জমকাইয়া দেয়। কাজেই ছাদের উপরে জমকাল শব্দ দুপদাপ, দুমদাম, দড়বড়, দুড়দুড়। যে ঘরের ছাদে ঐ রূপ দমদম শব্দ হয়, সেই ঘরের নাম দমদমা। বন্দুকের আওয়াজ গম্ভীর দুম; পিঠে কিল পতনের শব্দও দুম।

আগুন যখন লেলিহান শিখা আন্দোলন করিয়া দাহ্য পদার্থের স্তূপ গ্রাস করিতে থাকে, তখন উহা দপ দপ করিয়া বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলে। প্রদীপের ছোট শিখা দিপ দিপ করে। আগুনের মত জ্বালাকর ফোড়ার দপদপানি বা দবদবানি ভুক্তভোগীর পরিচিত; উহার জ্বালার মধ্যে অগ্নিশিখার স্পন্দন যেন প্রচ্ছন্ন থাকে। দুম্বা, দাবা, দাবনা ও দাবানর এবং দামশানর মধ্যে দ-কারের ধ্বনির ঘোষ আছে। 'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে', এখানে দড়বড় শব্দে যেন ঘোড়ার পদশব্দই শোনা যাইতেছে। দ্রুত গতিতে পথ চলার নাম দৌড়ান; সংস্কৃত দ্রু ধাতুর মূল কি এইখানে? লাঠি তুলিয়া কাহাকেও দাবড়াইলে অর্থাৎ তাড়াইলে সে দুরদার করিয়া দৌড় দেয়; আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত

হইলে বুক দুর দুর করে। 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর, উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর'—এখানে মেঘ বায়ুবেগে যেন দুর দুর শব্দে দ্রুত চলিতেছে।

তলতলে, থলথলে জিনিষের সজাতীয় দলদলে। দলদলে জিনিষ দল্লাইয়া (সংস্কৃতে, দলিত করিয়া) তৈয়ার করা চলে। দোলো চিনি কি ঐরূপে দল্লাইয়া প্রস্তুত হয়? গ্রাম্য ভাষায় ঐরূপ দলন-যোগ্য জিনিষ দকর-কোচো।

ধ

দ'য়ের মত ধ ঘোষবান্, উপরন্তু মহাপ্রাণ। হালকা জিনিষ যেখানে দপ করে, ভারী জিনিষ সেখানে ধপ শব্দ করিয়া পড়ে। দপদপ, দুপদাপ এর চেয়ে ধপ ধপ, ধুপ ধাপ এর গুরুত্ব বেশী। থেই থেই নাচের চেয়ে ধেই ধেই নাচের গুরুত্ব বেশী। পৃষ্ঠোপরি দুমদাম কিলের চেয়ে ধমাধম বা ধপাধপ কিলের গুরুত্ব অধিক। ধুমধাম বা ধুমধরাক্কা কর্ম্মের আড়ম্বরের গুরুত্ব প্রকাশ করে। আগুন যেমন দাউ দাউ জ্বলে, তেমনি ধূধূ বা ধাঁধাঁ করিয়া জ্বলে; মহাদেবের 'ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে'। নির্ব্বাণপ্রায় বহ্নিও ধিকি ধিকি জ্বলে। স্পন্দনগতির এই ধকধকানি মৃদু হইয়া ধুকধুকনিতে পরিণত হয়; মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকির সহিত 'রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ' একেবারে থামিয়া যায়। শিশুর কণ্ঠে দোদুল্যমান সোণার ধুকধুকি তাহার ছোট্ট হৃদয়ের ধুকধুকনির সহিত দুলিতে থাকে। ধপ ধপ শব্দে সোপানের প্রতি ধাপে পা ফেলা হয়। দড়বড় দৌড়ানির পর বুক ধসধস এবং হঠাৎ আতঙ্কে ধরাস করে; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বুক ধড়ফড় করে। কাটা পাঁঠা

যখন ধ ড় ফ ড় করিয়া হাত পা আছড়ায়, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত-ধারা ঝলকে ঝলকে থামিয়া থামিয়া কর্ত্তিত গ্রীবা হইতে বেগে নিঃসৃত হয়।

উপরে বলিয়াছি ধ'য়ের ধ্বনিতে গুরুত্ব ও স্থূলত্বের অর্থ টানিয়া আনে। ধে ড়ে মিন্‌সের স্থূলত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। উহা স্ত্রীলিঙ্গে ধা ড়ী—জানোয়ারের পক্ষে প্রযোজ্য। ধে ড়ে মিন্‌সে, যার ইন্দ্রিয়গুলাও মোটা, তাহার সকল কাজই ধ্যা ব ড়া, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ধ্যা ড়া য়। ধে ড়ে মিন্‌সেকে জোরে ধা ক্কা না দিলে তাহার ইন্দ্রিয় সজাগ হয় না; তাহাতেও তাহার ধো কা লাগে, অথবা ধাঁ ধাঁ লাগে বা ধা ধ স লাগে মাত্র; সে কি করিবে, ঠাহর পায় না। হেঁয়ালির ভাষায় মূর্খকে লাগে ধ ন্ধ; উহাই ধাঁ ধাঁ। ধেড়ে মিন্‌সের কাজ কর্ম্মের ধা ক ধি চ নাই; তাহার সকল কাজই এলো-ধা ব ড়ি গোছের। মোটা মানুষের নাচ ধি ন ধি নি নৃত্য। বাতাসে ধা ক্কা দিয়া বেগে চলার নাম ধাঁ করিয়া চলা। ধ ম ক দিলে এবং ধা প্পা দিলে মনে গুরুতর ধা ক্কা লাগে, সন্দেহ নাই। লোকের ধাঁ ই চ বুঝা তাহার চা'ল চলনের ভঙ্গী বুঝা। চা'ল চলনে বিসদৃশ ভঙ্গীর নাম ধাঁ ই চা। বৃহৎ পাহাড় ভূকম্পে ধ স শব্দে ধ সি য়া পড়ে।

তুলা ধুনিবার সময় ধুন্ ধা ন শব্দ হয়; যে ধো নে, তাহার উপাধি ধু নু ই। ধু মু শ, ধু সো, ধু চু নি, ধু কু ড়, ধা মা প্রভৃতি গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য বস্তু টেকসই অল্প মূল্যের মোটা জিনিষ। মোটা জিনিষের উপর ধ ধ ল পড়ে বেশী।

ন

ত-বর্গের ধ্বনি কোমলতাব্যঞ্জক; তাহার উপর অনুনাসিকত্ব যোগ হইলে উহা আরও কোমলের, এমন কি একবারে কাঠিন্যবর্জ্জিতের, লক্ষণ টানিয়া আনে। ন-কারাদি শব্দে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখি। এরূপ শব্দ বড় বেশী নাই; যাহা আছে, তাহার অধিকাংশেই ঐ ভাব প্রবল।

ন্যাচা, নোচা, ন্যাদা, নদনদে, নাদুসনুদুস, নধর, ন্যাঙা, ন্যাঙড়া ইত্যাদি শব্দ কোমলতা ও অস্থিহীনতা সূচনা করে। নচনচ, নচপচ, নেংচান, নেতার, নেঞ্জুর, নেস্তি ইত্যাদিও তুলনাযোগ্য।

যাহা কাঠিন্যবর্জ্জিত, মেরুদণ্ডহীন, তাহা নরম, তাহা নড়নড় করে, নড়বড় করে; সহজে নড়িয়া যায়; এমন কি লতাইয়া গিয়া নড়রবড়র করে। যাহা একবারে এলাইয়া লতাইয়া পড়ে, তাহা নিড়বিড়ে, নিশপিশে, নিংনিঙে। যাহা সহজে নড়ে, তাহাকে অনায়াসে নাড়া বা নেকড়ান যায়, তাহা নেকড়া। নেকড়ে বাঘ বোধ করি তাহার শিকারকে নেকড়িয়া যাতনা দিয়া বধ করে। নেকড়াকে বা কাপড়মাত্রকে অনায়াসে নিঙড়াইয়া জল বাহির করা যায়। এই শ্রেণির জিনিষ সহজেই নোঙড়া হয়; নোঙড়া জিনিষ দেখিলে নেকার (সংস্কৃতে ন্যক্কার) আসে। ডানি হাতের মত বাম হাত বা নেঙা হাত আমাদের বশে থাকে না; উহা যেন নড়নড়ে;—ন্যাঙরা লোকে কিন্তু তাহার নড়নড়ে ডানি হাতের বদলে বাম হাত ব্যবহার করে। নুলো পঞ্চাননের হাত কিরূপ ছিল? যে আপনাকে ধরিতে ছুইতে দেয় না, মেরুদণ্ডহীনের মত হাত হইতে পিছলাইয়া যায়, সে ন্যাকা সাজে। কঠিন ভূমির কোমল ঘাস নাড়িয়া উপড়ানর নাম নিড়েন; জমির ঘাসের মত মাথার চুল যার নিড়েন হইয়াছে, সেই কি নেড়া?

ট-বর্গ—ট

ত-বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক, আর ট-বর্গের সহিত সম্পর্ক কাঠিন্যের। টকটক, টুকটাক, টক্কর, ঠোকর প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংঘট্টের পরিচয় দেয়।

সানুনাসিক টুং টাং শব্দে ধাতব তন্ত্রীর কাঠিন্য স্মরণ করায়; কলিকাতার রাস্তায় ঢন্ ঢন্ শব্দ উড়িষ্যাবাসিবাহিত কাংস্যফলকের কাঠিন্য ঘোষণা করে।

যে কোন কোষগ্রন্থ খুলিলেই দেখা যাইবে, ট-কারাদি, ঠ-কারাদি, ড-কারাদি, ঢ-কারাদি সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অতি অল্প; যে সকল শব্দ রহিয়াছে, তাহাদেরও অনেকগুলি নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ। অনুমান হয় যে দেশজ শব্দ কালে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা আরও কম। ইহাতে অনুমান হইতে পারে, প্রাচীন আর্য্য ভাষায় হয় ত এককালে ট বর্গের ধ্বনির অথবা মূর্দ্ধন্য ধ্বনির অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপের ভাষাগুলিও বোধ হয় এই অনুমান সমর্থন করে।

টিঁ টিঁ, ট্যাঁ ট্যাঁ, ইত্যাদি ট-কারাদি বহু শব্দ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণজাত; তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। টিয়া পাখী ও টুনটুনি ও ট্যাসকোনা পাখী কি তাহাদের স্বর হইতে নাম পাইয়াছে? টং, টংটং, টুংটাং, টাংটুং প্রভৃতি ধ্বনি সর্ব্বজনপরিচিত; উহাদের অনুনাসিক অংশ ধাতুপদার্থে অন্য কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে এই অনুনাসিক স্বরের উৎপাদন কঠিন ধাতুপদার্থের বিশিষ্টতা। তবে ঢাকের ট্যাং ট্যাং মধ্যেও অনুনাসিকত্ব আছে বটে। টঙস টঙস ধ্বনি স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ মাত্র। ধনুকের ছিলাতে টং শব্দে টঙ্কার দেওয়া হয়। রৌপ্যমুদ্রার বা রূপেয়ার বিশুদ্ধি পরীক্ষার্থ টং বা টুং শব্দে বাজাইয়া লওয়া হয়; এই জন্যই কি উহা টঙ্ক বা টাকা? সম্ভবতঃ ঐরূপ ধ্বনি হইতে সোহাগার নাম টঙ্কন। টিকটিকি সময়ে অসময়ে টিক টিক করিয়া বিরক্তি জন্মায়; কাজেই কাণের কাছে টিক টিক করার অর্থ বিরক্তি উৎপাদন। কাঠের

উপরে পাথরের বা ইটের আঘাতে ট ক শব্দ হয়, ঐ শব্দ পুনঃ পুনঃ ঘটিলে ট ক ট ক হয়; ট ক ট ক ছোট হইয়া হয় টু ক টু ক এবং টু ক টা ক। রাস্তায় ইটকাঠে পায়ের আঘাতের নাম ট ক্ক র; অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাতও ট ক্ক র। পৌষমাসের প্রাতে ঠাণ্ডা জল যেন ত্বগিন্দ্রিয়ে আঘাত করিয়া হাতে টা কু ই বা টা ক রা নি ধরায়। টি ট কা রি র অন্তর্গত দুটা ট পর পর আসিয়া অন্তঃকরণে কঠিন আঘাত সূচনা করে।

কোন একটা জিনিষ আমরা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাই; তাহাতেও সন্দেহ থাকিলে একটা যষ্টির স্পর্শ দ্বারা বা আঘাতের দ্বারা দেখাইলে আর সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সেই যষ্টির আঘাতের শব্দ ট ক্ বা টা। অঙ্গুলি নির্দ্দেশেও যখন বলি এই টা বা ঐ জিনিষ টা, তখন ঐ টা প্রত্যয়ে সেই যষ্টির আঘাতের কাজ করে। বড় জিনিষের বেলায় টা, ছোট জিনিষের বেলায় টি—যথা মহিষ-টা, আর বাছুর-টি। টি মাত্রা কমিয়া টু’ তে বা টু কু’ তে পরিণত হয়; যথা এক টু, জল টু কু, তেল টু কু। টি ও টু কু ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক—তাহা হইতে উৎপন্ন টু ক রা ও টি ক লি। কেশমধ্যে লম্বমান টি কি এবং তামাকুসেবীর টি কা মুখ্য অর্থে উহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক কি না বিবেচ্য। টু টি য়া যাওয়ার অর্থ ক্ষুদ্রত্ব-প্রাপ্তি। মানুষের যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কাজ ভ্রমণ, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম ট্যাং; উহা লোষ্ট কাষ্ঠাদি সকল দ্রব্যেই সর্ব্বদা ট ক্ক র দিতেছে। কঠিন ভূপৃষ্ঠের উপর ইতস্ততঃ বিনা কাজে বেড়ানর নাম টো টো করিয়া বেড়ান। বাঁশের টা টি হালকা হইলেও কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-কারের ধ্বনি আনে; কাঁসার টা ট ও কাঠিন্যহেতুক। ফোড়ার টা টা নি কঠিন বেদনা। তীব্র অম্লরস রসনায় কঠিন আঘাত দেয়, উহাতে ট ক শব্দ না হইলেও অম্ল জিনিষটা ট ক। অথবা অম্লরসের তাড়নায় জিহ্বা অনেক সময় মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়া ট ক শব্দও করিয়া থাকে; এইজন্য

অম্লরস ট ক। তীব্র লোহিতবর্ণ চক্ষুতে আঘাত দেয়—যেন ট ক ট ক করিয়া আঘাত দেয়—এইজন্য উহা রাঙা ট ক ট কে; জ্যোতি একটু মৃদু হইলে হয় রাঙা টু ক টু কে। রাঙা জিনিষ চোখে আঘাত করে, আবার অনেক সময়ে সুন্দরও লাগে; কাজেই সুন্দর গৌরবর্ণ শিশুকে টু ক টু কে ছেলে বলা যায়। কুঠারের আঘাতের শব্দ হইতে উহার নাম টা ঙি। ছোট ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতে কি উহার নাম টা টু? ঘোড়ার টা পে চলাও কি উহার পদশব্দ হইতে উৎপন্ন? মাথায় যেখানে চুল থাকে না, সেখানে ট ক শব্দে আঘাত আঘাতকারীর পক্ষে আমোদজনক—সেই স্থানটা টা ক; টে কো। মাথার কঠিন সম্পর্কে আসিয়া কোমল করতলপ্রযুক্ত তা লা ও তা লি পর্য্যন্ত টা লা ও টা লি তে পরিণত হয়। সংস্কৃতে তকু´ শব্দ থাকিলেও, টা কু র ভূপতনশব্দ ট কৃ। বাঁশের কিংবা বেতের তৈয়ারি টো কা ও টু ক ড়ি এবং তালপাতার তৈয়ারী ছোট টু কু ই গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়; উহাদের গায়ে টো কা মারিলে টু ক শব্দ হয়। টু ক নি র নকার উহার ধাতুময়তা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র।

ট'য়ের ধ্বনি কাঠিন্যব্যঞ্জক হইলেও তরল ও বায়বীয় পদার্থেও ঐ ধ্বনি আসে, বিশেষতঃ প-বর্গের ধ্বনির সহযোগে। ট গ ব গ শব্দে জল ফুটে; এস্থলে ট গে র পরবর্ত্তী ব গ টা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের অস্তিত্ব জানায়। বৃষ্টি পড়ে ট প ট প, টু প টা প; পুকুরের জলের উপর বৃষ্টিপতনের শব্দ টা পু র টু পু র। এই শব্দের সহিত বাতাসের সম্পর্ক আছে, সেইজন্য ট'য়ের পর প। বৃষ্টিবিন্দু, যাহা ট প করিয়া ভূমিস্পর্শ করে, তাহার নাম টো প; বড়শিতে বিদ্ধ মাছের টো পও জলে টু ব শব্দ করিয়া পড়ে। গুরুভার জিনিষ জলে ট বা ং করিয়া পড়ে। বৃষ্টির আরম্ভে মোটা জলের ফোঁটা টপ ট প বা টু প টা প করিয়া পড়ে। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও বৃষ্টির ক্ষীণ ধারা টি প টি প করিয়া

বা টিপির টিপির করিয়া বহুক্ষণ পড়িতে থাকে অর্থাৎ টিপোয়। বারিবিন্দুর মত যে কোন ছোট জিনিষ টুপটাপ করিয়া পড়িতে পারে; সূর্য্যির মা বুড়ী কাঠ কুড়াইতে গিয়া কলাগাছের আড়ে উপস্থিত হইলে টুপটাপ করিয়া কলা পড়িত। ট'য়ের পর প বসিলে স্বভাবতঃ বায়ুপূর্ণতার বা শূন্যগর্ভতার ভাব টানিয়া আনে। গরুর গাড়ির উপরের শূন্যগর্ভ আচ্ছাদনের নাম টপ্পর; বিবাহোন্মুখ বরের মাথার উপরের আচ্ছাদন টোপ'র; মস্তকের ছোটখাট আচ্ছাদন মাত্রের নাম টুপি। যে কার্য্যের বা বাক্যের ভিতর ফাঁপা, তাহার নাম টপ্পা। থালা ঘটি বাটি আঘাত পাইয়া টোপসা খায়, অথবা উহাতে টোল পড়ে। অধ্যাপকের টোলের সহিত ইহার কি সম্পর্ক? টোবো গালের ও টবকা লুচির ভিতরটা ফাঁপা। টোপা কুলে আঙুলের ডগা দিয়া জোরে টিপিলে বা টেপাটিপি করিলেও টোল পড়িতে পারে। লুচি রাখিবার বাঁশের ফাঁপা চুপড়িকে টালা বলে। কপালে টিপ বোধ করি টিপিয়া বসাইতে হয়। কাঁচা ফল, যাহা পাকিবার পূর্ব্বে নরম হইয়াছে মাত্র, যাহার গায়ে আঙুলের দাগে টোপসা পড়ে, উহা গ্রাম্য ভাষায় টোসো। কপালের ঘাম টসটস বা টুস টুস করিয়া টুসিয়া পড়ে—এস্থলে উষ্মবর্ণ স'য়ের যোগে তারল্যের ভাব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আঁকষির ডগায় ফাঁপা টুসি লাগাইয়া ফল পাড়ে। টোঙ্গা বা টোঙা নামক যান উহার শূন্যগর্ভতাসূচক হইলেও কঠিন কাষ্ঠে নির্ম্মিত বটে। টুঙ্গি সম্বন্ধেও ঐ কথা।

শিরার ভিতরে তরল রক্ত বেগে বহিলে উহা টিশ টিশ করিয়া টিশেয় ও কঠিন যাতনা দেয়। এখানেও উষ্মবর্ণ শ তারল্যসূচক। টনটনানি যে যাতনা বুঝায়, উহা তীক্ষ্ণ যাতনা; অনুনাসিক ন-কার এই তীক্ষ্ণতা আনে। টানাটানির মধ্যে দুটা ট পর পর

বসিয়া আঘাতের পর আঘাত সূচনা করে। শুকাইয়া টা ন সহিবার সামর্থ্য জন্মিলে হয় ট ন ট নে। আকস্মিক তীব্র বেদনায় মাথায় ট ন ক পড়ে। ট ন ক বেদনা সহিবার যার ক্ষমতা আছে, সে ট ন কো। টি ম টি মে জ্যোতির মৃদুতা অনুনাসিক ম-কারের লক্ষণযুক্ত।

ট ল ট ল, টু ল টু ল, ট ল ম ল করিয়া যাহা ট লি য়া বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য ট'য়ের পর কোমল দন্ত্যবর্ণ ল'য়ের যোগে আসে। ট হ ল দেওয়াতেও কি এইরূপ চঞ্চল গতির সূচনা করে? দ্রুত বিলম্বিত টা ল মা টা ল শব্দে বিলম্বিত গতির চঞ্চল অনিশ্চয় সূচনা করে।

ঠ

ট'য়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ঠ; উহাতে কাঠিন্য ও কঠোরতার ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঠ ক, ঠ ক ঠক, ঠু ক ঠা ক, ঠ ক্ক র, ঠো ক র, ঠো ক রা ন, ঠোঁ কা, ঠু ক রা ন, ঠু ক্‌ রো (ভ ঙ্গ প্র ব ণ), ঠি ক্‌ রে প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যের ঠ কা ঠ কি র কথা বলে। ঠ ক ঠ কি তাঁত হইতে কাঠ-ঠো ক রা পাখী পর্য্যন্ত এই আঘাতের ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। করতল কোমল হইলেও উহা যখন বেগে গণ্ডদেশে পতিত হয়, তখন চপেটাঘাতের ঠাঁ শব্দ বা ঠাঁ ই শব্দ কঠিনের আঘাতের শব্দের অনুকৃতি। কপালে কঠিন আঘাতের শব্দ ঠু ই। ধাতুফলকে হাতুড়ি পেটার শব্দ ঠং, ঠু ং, ঠা ং। রামাভিষেকে মদবিহ্বলা তরুণীদিগের কক্ষচ্যুত হেমঘট সোপানে অবরোহণ করিয়া ঠ ন নং ঠ ঠং ঠং ঠ ন নং ঠ ঠং ঠং শব্দ করিয়াছিল, তাহা হনুমান্ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। ঠু ন কো জিনিষ ভাঙিবার সময় ঠু ন শব্দ করে। কঠিন দ্রব্য কঠিন ভূমিতে আঘাত করিয়া

ঠিকরিয়া পড়ে। ঠক শব্দ কঠিন আঘাতের শব্দ ; ঠগ যাহাকে ঠকায়, সেও একটা কঠিন আঘাত পায়, সন্দেহ নাই। যাহা ঠুক করিয়া ভূপতনে উন্মুখ, তাহা ঠুকোর উপরে আছে ; তাহাকে ঠেকা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। ঠমকে চলা ভূপৃষ্ঠে চলারই রূপভেদ। কঠিন বাক্য অন্তরিন্দ্রিয়ে আঘাত দিলে, ঠাট্টায় পরিণত হয়। ঠাট ও ঠার এর সহিত ঠাট্টার নিকট সম্পর্ক। স্থিরার্থক ঠার শব্দে স্থা-ধাতুর কোমল থ কাঠিন্য বুঝাইবার জন্যই ঠ হইয়াছে। ঠেলা, ঠেকা, ঠোকা, ঠাসা, ঠোসা ক্রিয়ার কর্ম্মকারকের স্থলে প্রায় গুরুভার কঠিন দ্রব্য বসিয়া থাকে। ঠেঙা কঠিন অস্ত্র ; ঠেঙান কঠিন কর্ম্ম। গণ্ডদেশে কামিনীর কোমলকরপ্রদত্ত ঠোনার ও ঠোকনার কাঠিন্যসূচনা কিন্তু ক্ষমাযোগ্য নহে। ঠন্‌কো রোগে স্তনের গ্রন্থিগুলা কঠিন হয়। চোখের ঠুলি ঐ আচ্ছাদনের কাঠিন্যসূচক কি না, তাহা বিচার্য্য। ঠুলির রূপভেদ ঠুসি। মিষ্টান্নের ঠোলা অবশ্য ঠুঁলির চেয়ে আকারে বড়। ঠোলার রূপভেদ ঠোঙা। মাটির ছোট কলসীর ঠিলি নাম স্থালী হইতে আসিলেও উহার কাঠিন্য সূচনা করিতেছে। ঠেঁটা মানুষের প্রকৃতি এত কঠিন, যে উহাতে দাগ বসান শক্ত। ঠেঁটা লোক কৃপণ হয় ; ঠেঁটি কাপড় তাহারই যোগ্য। অঙ্গুলির লোপে কাঠিন্যপ্রাপ্ত করতল ঠুঁটো হাত। আঁখি যখন ঠল ঠল করে, তখন লকারের তারল্য ঠ'য়ের কাঠিন্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

ড

ড ও ঢ ট-বর্গের অন্তর্গত ঘোষবান্ ধ্বনি ; ঘোষবান্ ধ্বনির একটা গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব আছে, যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না। বস্তুতই ড-কারের ও ঢ-কারের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য উহাদের কাঠিন্যসূচনার ভাবকে

একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঢাক ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্রের চামড়ার নীচে অনেকটা বায়ু আবদ্ধ থাকে; চামড়ায় আঘাত করিলে সেই বায়ুটা ধ্বনিত হইয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজের উৎপত্তি করে। এই আওয়াজটার নামই 'ঘোষ'। দামামা দগড় দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের দ-কারাদি নামে আওয়াজের সেই গাম্ভীর্য্য বুঝায় দেখা গিয়াছে; ঢাকের শব্দ ড্যাং ড্যাং, ঢোলের শব্দ ডুগ ডুগ, ডগমগ প্রভৃতিতেও আওয়াজের গম্ভীরতার পরিচয় দেয়। ডিণ্ডিম, ডুগডুগি, ডুবকি, ডঙ্কা, ডম্বুর (ডমরু) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামেই উহাদের আওয়াজ ঘোষণা করিতেছে। বন্দুকের ডেহরের শব্দে এই গম্ভীরত্ব আছে। ডাহুক বা ডাবুক পাখীর নামের সহিত উহার ডাকের কোন সম্পর্ক আছে কি? দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া কাহাকেও যখন ডাকি, তখন সেই ডাকের সহিত কণ্ঠধ্বনির গাম্ভীর্য্যের সম্পর্ক অস্বীকার করা কঠিন। ডাইন্ বা ডাকিনী এইরূপ ডাক হইতে তাহার নাম পাইয়াছে কি? বাঙ্গলার গ্রাম্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ডাকের সহিত অনেকে ডাকিনীর সম্পর্ক অনুমান করেন। সে সম্পর্ক থাক বা না থাক, ডাকাইতের সহিত ডাকাডাকির সম্পর্ক থাকা অসঙ্গত নহে। ডাকাডাকিতে অন্তঃকরণে ডর উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ডামাডোলের শব্দের গুরুত্বে কোন সন্দেহ নাই। ডাং-পিটের সঙ্গে ডাকাইতের ও ড্যাকরার ও ডাকাবুকোর চরিত্রগত অনেকটা মিল আছে।

ঝাঁপা বাদ্যযন্ত্রে ডুং ডাং, ড্যাং ড্যাং শব্দ হয়; ড-কারাদি অনেকগুলি শব্দ ঘোষবত্তাহেতু এইরূপে শূন্য-গর্ভতার জ্ঞাপন করে। যথা ডাব (নারিকেল), ডাবা, ড্যাবরা, ডবড়বে, ডাবর, ডিবা, ডহক, ডোল, ডুলি, ডালা, ডালি, ডোঙা, ডিঙি, ডাগর, ডাকর, ডাকরান, ডোবা (খাল অর্থে),

ডুব, ডুবুরি, ডারা। ইহার মধ্যে ডোঙা ও ডিঙি সম্ভবতঃ সংস্কৃত দ্রোণ শব্দ হইতে উৎপন্ন; অন্য গুলির সংস্কৃত মূলাকর্ষণ দুঃসাধ্য।

ঢ

ড মহাপ্রাণ হইয়া ঢ হয়। ড'য়ের সমুদায় লক্ষণ বর্দ্ধিতবিক্রমে ঢ'য়ে বর্ত্তমান। ঢ'য়ের ধ্বনি ড'য়ের চেয়ে মোটা,—ধ' যেমন স্থূলত্বের ভাব আনে, ঢ'ও সেইরূপ স্থূলত্ব বোঝায়। ঢাক, ঢোল, ঢেঁড়রা প্রভৃতি অতি স্থূল বাদ্যযন্ত্রের নামে উহাদের গুরুগম্ভীর আওয়াজ মনে পাড়ায়। ঢং ঢং শব্দ কাঁসার ঘড়ির শব্দ; ধাতুপদার্থের ধ্বনিতে অনুনাসিকত্ব বর্ত্তমান। উচ্চ যশো-ধ্বনিতে ঢি ঢি পড়ে আর অপমানে ঢু ঢু লাগে। ফাঁপা জিনিষ মোটা হয়; অতএব ঢেকুর উদ্গারের ধ্বনির শূন্যগর্ভ উৎপত্তিস্থান স্মরণ করায়। ঢকঢক, ঢকঢুক, ঢুকঢাক, ঢুকুঢুকু শব্দে পানীয়বিশেষ জঠর মধ্যে ঢুকিতে থাকে। আচ্ছাদনার্থক ঢাকা আচ্ছাদনের শূন্যগর্ভতা সূচনা করে। যদ্দ্বারা ঢাকা যায়, তাহা ঢাকনা ও ঢাকি। ঢাল, ঢিলা, ঢিপ, ঢেঁকি, ঢিবি, ঢিল, ঢেলা, ঢেঁড়ি, ঢেড়া, ঢাঁড়স, ঢেউ, ঢাপুস, ঢিপসে, ঢোপসা, ঢেপুয়া, ঢেবুয়া, এই সমুদয় শব্দ স্থূলত্ব-বোধক। ঢন্‌ঢনে মাছি মাছির মধ্যে মোটা। ঢুণ্ঢি গণেশ গণেশের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে মোটা। স্থূলত্বের সহিত জড়তার, নিশ্চেষ্টতার, আলস্যের ভাব জড়িত;—যথা ঢিলা, ঢিমা, ঢোলা (তন্দ্রা), গা ঢিস ঢিস করা। ঢোঁড়া সাপ ও ঢ্যামনা সাপ মোটাসোটা বটে, অধিকন্তু নির্ব্বিষ ও নির্বীর্য্য। ঢপ কীর্ত্তনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ঢপঢপে, ঢ্যাবঢেবে দ্রব্য নিস্তেজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঢপ শব্দে

প্রণাম কিন্তু জোরে কঠিন মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম। ল'য়ের কোমলতা ঢ'য়ে তারল্য ভাব দেয়; ঢ ল ঢ ে ল জিনিষ ঢা লি তে পারা যায়। ঢা লু জায়গার ঢা লে র দিকে তরল দ্রব্য ঢ লি য়া পড়ে বা ঢা লা যায়। কলঙ্কের কাহিনী গাঢ় তরল রসের মত চারিদিকে ঢ লা ই য়া পড়িয়া ঢ লা নি তে পরিণত হয়। তন্দ্রাগত ব্যক্তির ঢুলুঢুলু আঁখিতে তারল্যের সহিত আলস্যের ভাব মিশ্রিত। এইজন্যই শিথিল ও তরল দ্রব্যের নামান্তর ঢি লা। কপালে ঢু দেওয়া ও ঢু সো দেওয়া তুল্যমূল্য; ঐ আঘাতও মোটা আঘাত। অকর্ম্মা লোকে যেমন মিছা কাজে টো টো করিয়া বেড়ায়, তেমনি ঢু ঢু করিয়া ঢু রি য়া বেড়ায়। ঢি পে ন ও ঢে কা ন ক্রিয়া মোটা মানুষের উপর প্রযোজ্য। ধাক্কার সঙ্গে ঢো কা র বোধ হয় সম্পর্ক আছে; যেখানে ফাঁক অবকাশ বা শূন্যতা আছে, সেইখানেই ঢু কি তে পারা যায়, এই হিসাবে ইহার সহিত শূন্যতারও সম্পর্ক আছে। চামরের দো ল ন কি স্থূলত্ব পাইয়া ঢো লা ন হয়?

চ-বর্গ—চ

রামাভিষেকে যে হেমঘট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, উহা সোপান হইতে পড়িবার সময় ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে ছঃ শব্দ করিয়াছিল। এই ছঃ শব্দ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ; উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পর্শ ঘটনা সূচনা করিতেছে। চ-বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য। প-বর্গের সহিত যেমন বায়ুর, ত-বর্গের সহিত যেমন কোমলের, ট-বর্গের সহিত যেমন কঠিন পদার্থের সম্পর্ক, চ-বর্গের সহিত তেমনি তরল পদার্থের সম্পর্ক। স্বভাবজাত চিঁ চিঁ শব্দে এই তালব্য ধ্বনির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। চিঁ চিঁ হইতে চী ৎ কা র (সংস্কৃত), চেঁ চা ন, চেঁ চা মে চি প্রভৃতি আসি-

য়াছে। তরল জল চোঁয়ানর সময় চোঁ চোঁ শব্দ হয়। চোঁয়া ঢেকুরে বোধ করি চোঁয়ান দ্রব্যের গন্ধ থাকে। তপ্ত কটাহে গরম জল বা তেল চুঁ চুঁ করে। চিঁ চিঁ শব্দ করে বলিয়া কি পাখীর নাম চিল? উপরন্তু অল্পপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষণস্থায়িত্ব ও আকস্মিকত্ব সূচনা করে। চোঁ চোঁ শব্দে একটা তীক্ষ্ণতা আছে, উহা কাণে যেন আঘাত করে। অল্পপ্রাণ বর্ণে অনুনাসিক বর্ণ যোগে এই তীক্ষ্ণতা আনে। চনচন, চিনচিন প্রভৃতি শব্দে সেই তীক্ষ্ণতা স্পষ্ট; কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটায় যে বেদনা হয়, উহা চিনচিন বেদনা; রৌদ্র যখন তীক্ষ্ণ ছুরির মত আঘাত দেয়, তখন উহাও চনচনে বা চিনচিনে হয়। চুমো (সংস্কৃত চুম্বন) কি চুঁ শব্দের অনুকৃতিজাত? চুমোর সহিত চুমকুরির সম্পর্ক স্বীকার্য্য। মূর্দ্ধন্য বর্ণের যোগে কাঠিন্য বা কার্কশ্য পাইলে উহা চরচর, চিরচির, চুরচুর, চিড়চিড়, চিড়িরবিড়ির প্রভৃতি কঠোর বেদনাজনক শব্দে পরিণত হয়। চচ্চড়ি নামক পদার্থের রান্নার কি চরচর ধ্বনি জন্মে?

চিমটি কাটার তীব্র বেদনা প্রসিদ্ধ। লোহার চিমটা যন্ত্র জিনিষকে চিমটিয়া ধরিবার জন্য। চপ শব্দেও এই তীব্রতা আছে; ধারাল দায়ে চপ শব্দে আঘাতের নাম চোপান। তীব্র বাক্যের নাম চোঁপা। চাবুকের তীব্র আঘাতে চব শব্দ হয় বলিয়া কি উহা চাবুক? চপ করিয়া কোন জিনিষ চাপিয়া ধরিলে উহার চাঞ্চল্য হঠাৎ স্থগিত হয়; বাগিন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থামাইবার জন্যও চুপ বলিতে হয়। চাঞ্চল্য থামাইয়া স্থির থাকার নাম চুপ করিয়া বা চুপচাপ করিয়া থাকা। চাপড় অর্থাৎ চপেটাঘাতের আকস্মিক তীব্রতা প্রসিদ্ধ। চপেট আঘাত দ্বারা চাপ দিয়া যাহা চ্যাপটা করা যায়, তাহাই চিপিটক বা চিড়া। চপেটা ষষ্ঠী বা চাপড়া ষা'ট দেবতা ঐ বিশেষণ কেন পাইলেন? চওড়া

কি চ্যা প টা র ই উচ্চারণ ভেদ? কাঠ চি ড়ি য়া চ্যা প টা তক্তা হয়। পাটের সূতায় যে চ ট তৈয়ারি হয়, উহাও চ্যা প টা জিনিষ। তালপাতের চা টা ই ঐরূপ চ্যা ট লা আসন। চ ট ছোট হইলে চ টি হয়। চ টি বই আর চ টি জুতা উভয়ই পাতলা চ্যা ট লা জিনিষ। চ টে র ই অল্পার্থে চি ট, যথা চি ট কাগজ বা কাগজের চি ঠি। পাতলা লোহার চা টু র উপরে রুটি সেঁকিতে হয়। ময়দা চ ট কি য়া পরে চি চ কি দিয়া চা টু তে রাখে। চ ট করিয়া কাজে যে আকস্মিকতা আছে, উহা চ প করিয়া চা পনে র আকস্মিকতার অনুরূপ। চ ট প ট কাজের আকস্মিকতা বা দ্রুততা অত্যন্ত অধিক। দ্রুতগতি অর্থে চ ট কি য়া চলা। চ ট প ট বা চো ট পা ট করিয়া চা ট বা ট বা চি ট বি ট তুলিয়া চো চা প টে কাজ শেষ করিলেই চ ট ক জন্মে। চু ট কি কবিতার বা গল্পের ক্ষুদ্রতা ও তীব্রতা স্পষ্ট; উহার উদ্দেশ্য চ ট ক লাগান। চ ট শব্দে চোটাইলে জিনিষ সহসা ফাটিয়া চ টি য়া যায়; উহার গায়ে চ টা উঠে। তবলার চা টি তে চ ট শব্দ হয়। যে ব্যক্তি চ ট করিয়া সহসা রাগ করে, তাহার মেজাজ চ টা। চ ট করিয়া অকস্মাৎ আঘাতের নাম চো ট; আঘাত ক্রিয়ার নাম চোঁ টা ন। চ ট র প ট র খাঁটি ধ্বনিমূলক শব্দ। বিদ্যুতের চি ড়ি ক উহার দ্রুততার জ্ঞাপক।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনির ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা, তীব্রতা যত স্পষ্ট বুঝাইতেছে, চ বর্গের তারল্যসূচনা তেমন স্পষ্টভাবে নাই। তবে তারল্যসূচক চ-কারাদি শব্দের অভাব নাই। তরল পদার্থের মধ্যে আবার দুধ তেল ঘি প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের সহিত চ'য়ের সম্পর্ক কিছু অধিক। বিড়াল চ ক চ ক শব্দে দুধের বাটিতে জিব দিয়া চা খে বা আস্বাদন লয়। ধাতুপদার্থের পিঠে তেল মাখাইয়া মসৃণ করিয়া ঐ পিঠে আঙুলের ঠেলা দিলে চ ক শব্দ হয়। ঐরূপ জিনিষকে তেল-চ ক চ কে

বা তেল-চু ক চু কে জিনিষ বলা যায়। তেল মাখাইলে যখন মস্হণ হয়, তখন উহার আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা জন্মে। তেলমাখান মস্হণ জিনিষে মুখ দেখা যায়, প্রতিবিম্ব পড়ে; উহা আলো ছড়ায়; কাজেই চ ক চ কে র মুখ্য অর্থ, যাহার স্পর্শে চ ক চ ক শব্দ হয়, কিন্তু গৌণ অর্থ যাহা আলো ছড়াইয়া উজ্জ্বল দেখায়; এই অর্থ চ ক চ কে, চু ক চু কে, চি ক চি কে, চি ক ণ, চ ক ম কে, চি ক মি কে, চ ক ম কি (পাথর—যাহা আগুন উদ্গিরণ করে), চা ক চি ক্য প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। রেশমের চি ক চি ক ণ দ্রব্য। চি ক পরদা কি সেকালে রেশমে প্রস্তুত হইত? চা কু ছুরির ফলক চ ক চ কে। যাহা ঔজ্জ্বল্যে চ ক ম ক করে, তাহা চ ম ক জন্মায়, তাহা চ ম ৎ কা র। চ ম ক লাগিলে লোকে চ ম কি য়া উঠে; চৈতন্য লাভে চা ঙ্গা হয়। চো কা চো কা বাণে বোধ করি বাণের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণতা স্পষ্টতর। ফলের খোসা মস্হণতা হেতু চোঁ কা; গোমের খোসা হইতে চো ক ল হয়। বাঁশের মস্হণ ত্বক্ তীক্ষ্ণ ছুরিতে চাঁ ছি রা চাঁ ছ ও চেঁা ছ তৈয়ার হয়। তপ্ত কটাহ হইতে ক্ষীরের অবশেষ চাঁছিয়া লইলে হয় চাঁ ছি।

তরল রস গাঢ় হইলে উহা আটায় পরিণত হয়, উহাতে কঠিন দ্রব্য পরস্পর জোড়া লাগে। চ'য়ের তারল্য ও ট'য়ের কাঠিন্যসূচনা একত্র মিলাইয়া আটার মত জিনিষ চ ট চ ট করে—উহা চ ট চ টে, চ্যা ট-চে টে, চি ট চি টে হয়। চি টা গুড় চ ট চ টে আটার মত গাঢ়; চি টে ল মানুষ আপন কাজে আটার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না। চি ম ড়া জিনিষ দাঁতে ছাড়ান যায় না। গাঢ় চ ট চ টে পানীয় দ্রব্য পান করা দুঃসাধ্য, উহা জিব দিয়া চা টি তে হয়। যাহা চা টি তে হয়, তাহা চা ট বা চা ট নি। চ্যা টাং চ্যা টাং কথা যেন গাঢ় ভাবে শ্রোতার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হয়।

জলাশয়ের জলে ঝাঁপ দিলে চব শব্দ হয়; জলে চুবাইলে চব শব্দ জন্মে; উহার ব-কার ধ্বনি বায়ুর আঘাতে উৎপন্ন। চবচবে জিনিষ আদ্র জিনিষ; উহা জলে চবচব করে। ব্লটিং কাগজ কালিতে ভিজিয়া চবিয়া যায়। ভিজা কাগজ কাজে লাগে না, উহা চোতা কাগজ। চোপসা কি টোপসার প্রকারভেদ?

চ-কার তারল্যব্যঞ্জক, আর ল-কারও তারল্যব্যঞ্জক; উভয়ের যোগে অতিশয় চাঞ্চল্যের ভাব আসে। সংস্কৃত গত্যর্থক চল ধাতুর সহিত ইহার কিছু সম্পর্ক আছে কি? অন্ততঃ চঞ্চলের চাঞ্চল্য উপেক্ষা করিতে পারি না। সংস্কৃত চপল শব্দও চঞ্চলের অনুরূপ। সংস্কৃতে যাহাই হউক, বাঙ্গলায় চলচল করিয়া চলা, চুলচুল করা, চুলবুল করা, চুলকান প্রভৃতির গত্যর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেশার্থক চুল শব্দটির সংস্কৃত মূল আছে কি? না থাকিলে উহার নামের সহিত চাঞ্চল্যের সম্পর্ক আনা চলে না কি? চাঁচর চুলের চঞ্চল শোভা দর্শনীয় বটে। চ্যাংড়া মানুষ কি চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ? চ্যাং মাছ কিরূপ?

তরল পদার্থ কখন কখন চুষিতে হয়; চোষার মূল সংস্কৃতে থাকিলেও উহাতে তরল দ্রব্যের পানক্রিয়াজাত ধ্বনির অনুকরণ জ্ঞাপন করে না কি? চাটুকারের নাম চুচকো হইল কেন?

ছ

চ'য়ের লক্ষণ ছ'য়ে বর্ত্তমান আছে, তবে চ'য়ের চেয়ে ছ'য়ের জোর বেশী, কেননা উহা মহাপ্রাণ। কুকুর তাড়ানর সঙ্কেত ছেই। জোরে ঘৃণাপ্রকাশে মুখ হইতে শব্দ বাহির হয় ছিঃ বা ছ্যাঃ বা ছোঃ। ঘৃণার সহিত পরিত্যাজ্য ভস্মের নাম ছাই। সাপের

ছোঁ। অনুকরণজাত শব্দ; কাজেই সাপের কামড় ছোবল। চিলেও *ছোঁ দিয়া মাছ লইয়া যায়;* ছোঁ দিয়া ছুঁইয়া লয়। স্পর্শার্থক ছোয়া কি সেই ছোঁয়ার সহিত অভিন্ন?

তপ্ত কটাহে তেল ছেঁক শব্দ করে; গরম দ্রব্যই ছেঁকছেঁকে; উহা ছেঁকা দেয়। তরল পদার্থই কাপড়ে ছাঁকে; ছাঁকিবার যন্ত্র ছাঁকনা ও ছাঁকনি। ছেঁক শব্দে যাহার রান্না হয়, তাহা ছেঁচকি। রান্নার ছাঁচন কি ঐ জন্য? গরম তেলে পাঁচ ফোরণ দিয়া ছঁওকাইতে হয়। যাহার ছুতা বাই (বায়ু রোগ) আছে, সে কোন জিনিষ ছুইতে চাহে না, আর সকল কাজে ছুত ধরে। ছুত ধরার প্রবৃত্তি হইতে ছুতো-নতা।

ছু ছুঁ শব্দ করে বলিয়া জানোয়ারের নাম ছুঁচা; ছুঁচার মত ঘৃণ্য মানুষও ছুঁচো। কথায় অকথায় ছিঁচ্ করিয়া যে কাঁদে, সে ছিঁচ-কাঁদুনে।

চপ জোরাল হইলে ছপ হয়। ছপছপ, ছিপছিপ, বৃষ্টি-পাতের শব্দ। হালকা বেতের মত দ্রব্যের সঞ্চালনের শব্দ ছিপছিপ; ঐ জন্যই কি মাছ ধরিবার ছিপ এবং বোতল আঁটিবার ছিপি? ঐ কারণেই হালকা দ্রব্য—হালকা মানুষ—পর্য্যন্ত ছিপছিপে। চাপ জোরে দিলে ছাপ এ পরিণত হয়। ছাপা-যন্ত্র,—যাহার ইংরেজি নাম press—তাহার খাঁটি অনুবাদ চাপা যন্ত্র। দোষীর অপরাধ চাপিয়া রাখার নাম ছাপান। কাপড়ের উপর রঞ্জনার্থ তরল রঙের ছাপের নাম ছোপ; ছোপ দেওয়ার নাম ছোবান। ছাপের সঙ্গে ছাঁচের সাদৃশ্য আছে। ছপ্পর খাট ও চাল-ছপ্পর কিরূপে ঐ নাম পাইল? ফাঁপা বলিয়া নহে ত? মধ্যস্থিত জোড়া প' এজন্য দায়ী; টপ্পরের সহিত উহা তুলনীয়। চনচনে যে তীক্ষ্ণ বেদনা বুঝায়, ছনছনে ও তাহাই বুঝায়।

এই তীক্ষ্ণতা ন-কারের। ছিনে জোঁক গায়ে কাটিয়া ধরে। আতঙ্কে—বিশেষতঃ ভূতের ভয়ে—গা ছমছম করে।

মসৃণ ভূপৃষ্ঠের উপর গুরুভার দ্রব্য টানিয়া ছেঁচড়াইতে হয়। এক একটা লোকের স্বভাব এমনি যে তাহাকে ক্রমাগত নাড়া না দিলে বা না ছেঁচড়াইলে কাজ আদায় হয় না, সেইরূপ লোক ছেঁচড়। ছেকড়া গাড়ী বা ছক্কর *তাহার আরোহীকে ছেঁচড়ায় বলিয়া কি নাম সার্থক করিয়াছে? ছোকরা বালকের সহিত তাহার কি সম্পর্ক?

চিমড়া জিনিষের রূপভেদ ছিবড়া। ছিবড়া জিনিষ স্থূলতা পাইলে ছোবড়া হয়। ছিমরি মাছ ঐ নাম পাইল কেন? ছ'য়ে ট' যোগ করিলে ট-বর্গের কাঠিন্য আসিয়া ছ'য়ের তারল্যকে ঢাকিয়া দেয়। ইটের মত শক্ত জিনিষ ছট করিয়া ছটকিয়া পড়ে। ছটকানর রূপভেদ ছিটকান। ছাঁটিবার সময় টুকরা ছাঁট সকলও দূরে ছটকিয়া পড়ে। বৃষ্টির ছাইট ঘরের ভিতরে ছটকিয়া আসে। হাতপায়ের মাংসপেশী হঠাৎ কাঠিন্য পাইলে ছিটেশ ধরে;—উহার বেদনাও কঠিন বেদনা। একপ্রান্তে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিলে যাহা ছট্ শব্দে পড়ে, তাহা ছিটকানিতে পরিণত হয়। ঢিল যখন ছিটকিয়া পড়ে, তখন দূরে গিয়া পড়ে। ছট্ করিয়া ছটকিয়া পড়ার প্রবৃত্তি ছটফটি বা ছটফটানি। দূরে প্রক্ষেপের নাম ছোড়া;—ছুড়িয়া ফেলায় ও ছটকিয়া পড়ায় সমান ফল। দূর দেশ লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবনের নাম ছোটা। ছুটি পাইলে ছেলেরা ছুট দিয়া রাস্তায় ছুটে। ছট্ করিয়া যাহা বন্দুকের ভিতর হইতে ছোড়া যায়, তাহা ছটড়া বা ছররা। কাঠিন্যহেতু উহার শব্দ কর্কশ; উহা ফেলিলে ছরছর শব্দ জন্মে। ছড়ছড় শব্দে ফেলার নামান্তর ছড়ান। ছাড়ানও প্রায় তদ্রূপ।

শব্দের বীজ জমিতে ছড়ানর নামান্তর ছিটেন। ছেঁড়া ও ছেনার মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতে ছড়ির মূল আবিষ্কার বোধ করি দুঃসাধ্য। বেতের ছড় ছোট হইয়া ছড়ি হয়। চুটকি কবিতার টুকরা, যাহা দেশ মধ্যে ছড়াইয়া আছে, অথবা যাহা ছড়ির মত অন্তঃকরণে আঘাত দেয়, তাহাই কি ছড়া?

নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া ছলছল করে; এখানে ল-কার যোগে তারল্যের ভাব অতি স্পষ্ট; তারল্যের সহিত চাঞ্চল্যও একটু আছে। জলের পিঠে ঢিল ছুড়িয়া ছুলছুলি খেলা এই প্রসঙ্গে মনে আসিবে। তরল চঞ্চল হীনপ্রকৃতির লোককে ছুল্লু বলে। কঠিন দ্রব্যের কোমল ত্বক্‌কে ছাল বলে। ছাল ছোট হইলে হয় ছিলকে; উহা কি শল্কের অপভ্রংশ? ছোলার বীজের ছাল সহজে ছুলিয়া তোলা যায়। ছুরি দিয়া ছাল ছিলিতে বা ছুলিতে পারা যায়। তালব্য ছ-কারের পর দন্ত্য ল-কার বসিয়া এই তরলতা ও কোমলতা স্পষ্ট করিয়া দেয়। ছ্যাবলা ও ছিবলে মানুষের চরিত্র তরল। ছাওয়াল ও ছেলে কি তাহার কোমলতা হইতে নাম পাইয়াছে?

চ ও ছ'য়ের তুলনায় জ'য়ের জাঁক বেশী; উহা গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা করে। জাঁক শব্দটাতেই তাহার পরিচয়।

জগজগাতে চকচকে জিনিষের চাকচিক্য আরও জাঁকাইয়া আছে; জগজগ করা বা জুগজুগ করার অর্থ দীপ্তি বিকাশ করা। চমক চেয়ে জমক বেশী জমকাল বা জাঁকাল। জাঁকের উপর জমক বসাইলে উহা জাঁকজমকে পরিণত হয়। চমচম, ছমছম চেয়ে জমজমার গাম্ভীর্য্য বেশী। লোক জোটাইয়া বা জড় করিয়া জটলা করিলে কর্ম্মের গুরুত্ব বাড়ে বটে।

উজ্জ্বল দ্রব্যকে জ ল জ লে বা জি ল জি লে বলিয়া থাকে। এখানে মূলে হয় ত সংস্কৃত জ্বল ধাতু বর্ত্তমান। উজ্জ্বল দ্রব্যেই জে ল্লা দেয়।

চ ব চ বে জিনিষ আর্দ্র বটে; স্থূলতার সহিত আর্দ্রতা মিশিলে জ ব জ বে বা জ্যা ব জে বে বলা হয়। স্থূল কাজ জো ব দা।

জু জু নামক জীবের দীপ্তি আছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু শিশুদের নিকট উহার গুরুত্বের ইয়ত্তা নাই। জ ব র জং শব্দের অর্থ কি?

ঝ

ঝ'য়ের ডাক জ'য়ের মত; অধিকন্তু উহার বল জ'য়ের চেয়ে বেশী।

ঝিঁ ঝিঁ পোকা তাহার ডাক হইতে নাম পাইয়াছে; ঝ ঙ্কা রে র উৎপত্তি ধাতুনির্ম্মিত তন্ত্রীর ধ্বনি হইতে। অস্ত্রের ঝ ঞ্ঝ না কাব্যে প্রসিদ্ধ। শিশুর খেলানা ঝু ম ঝু মি ঝু ম ঝু ম করিয়া বাজে। ঝু মু রে র গীত-বাদ্য কি ঐরূপ ধ্বনি হইতে? ঝ ন্ ঝ ন্ বা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করে বলিয়া কাংস্যময় করতালের নাম ঝাঁ ঝ। ধাতুনির্ম্মিত ঝাঁ ঝে র অনুনাসিক ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিঁধে। তীব্রধর্ম্মাত্মক অন্যান্য জিনিষেরও ঝাঁ ঝ থাকে। মধ্যাহ্নে রৌদ্রের ঝাঁ ঝ স্পর্শেন্দ্রিয়ে এবং তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত লঙ্কার ঝাঁঝ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বিঁধে। ছয়টা রসের মধ্যে যে রসটা ঝাঁ ঝা ল বেশী, তাহা ঝা ল।

ঝ ঞ্ঝা বায়ু প্রবল বাত্যার ধ্বনির অনুকরণে নাম পাইয়াছে। ঝঞ্ঝার মত যাহা কষ্টে ফেলে, তাহা ঝ ঞ্ঝা ট। চিন্‌চিনের তীব্রতা ঝি ন-ঝি নে আছে; পা ঝি ন ঝি ন করিলে এই বেদনা অনুভূত হয়। নারীর পায়ে মলের শব্দ ঝ ম ঝ ম বা ঝ ম র ঝ ম র এবং বৃষ্টিপাতের শব্দ ঝ ম ঝ ম, ঝ মা ঝ ম, ঝি ম ঝি ম, স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন। ইট পুড়িয়া ঝা মা হইলে উহা আঘাতে ঝ ম ঝ ম শব্দ করে। বৃষ্টিপাতের ঝ ম র ঝ ম র শব্দ হইতে জলের ঝা ম রা ন। চ ন চ ন

গুরুত্ব পাইয়া ঝ ন ঝ ন হয়। ঝ ন ঝ নে বেলায় রৌদ্র প্রখর হয়। ঝু নে। নারিকেলের জলের আস্বাদন তীব্র। মানুষের স্বভাব কড়া ও তীব্র হইলে তাহাকে ঝা ঝু বলে।

চকচকে জিনিষই ঝ ক ঝ ক করে। ঝি ক ঝি কে বেলা ও *ঝি কি মি কি রৌদ্রে* আমরা চিকচিকে ও চিকিমিকির ঔজ্জ্বল্য আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাই। ঝি নু কে র খোলার গায়েও ঐ উজ্জ্বলতা রহিয়াছে।

চ ট শব্দে যে দ্রুততা ও আকস্মিকতা আছে, ঝ ট শব্দেও তাহা বিদ্যমান। এখানে ঘোষবান্ এবং মহাপ্রাণ ঝ-কার ঘোষহীন অল্পপ্রাণ ট-কারের ধ্বনিকে অভিভূত করিতে পারে নাই। চ ট বা চ ট প ট কাজ করা এবং ঝ ট প ট কাজ করা প্রায় তুল্যার্থক। এই ঝট্ হইতে সংস্কৃত ঝ টি তি উৎপন্ন, তাহাতে সংশয় নাই। ঝা ট শব্দের প্রয়োগও বাঙ্গলা কবিতায় পাওয়া যায়, উহার অর্থ শীঘ্র। ঝ ট অনুনাসিকত্ব পাইয়া ঝাঁ টা র শব্দে পরিণত হয়; ঝাঁ টা ন র অর্থ ঝাঁটার প্রয়োগ। ঝ ড় (সংস্কৃত ঝ টি কা) উহার বেগবত্তা বা উহার ধ্বনি হইতে নামে পাইয়াছে কি না বিচার্য্য।

ঝ প শব্দ ঊর্দ্ধ হইতে বেগে লম্ফ প্রদানের শব্দ। ঝু প ঝা প শব্দে নিম্নে অবতরণ প্রসিদ্ধ। ঝ প শব্দে লম্ফের নামান্তর ঝাঁ প বা ঝ ম্প। ঝাঁ পা নে র নৃত্য ঝম্প-বিশেষ। কর্ণভূষণ ঝাঁ প। নিম্নে ঝাঁপিয়া পড়িতে উন্মুখ। অন্নদামঙ্গলের অন্নপূর্ণার ঝাঁ পি কিরূপ? বৃষ্টিপাতেও ঝ প ঝপ শব্দ হয়; ঐরূপ ঝ প ঝ প শব্দে বেগে বৃষ্টির নাম ঝাঁ প টা ও ঝাঁ ই টা। ঝা প টি য়া ধরা বেগে চাপিয়া ধরা। ফলাদি পতনে যখন তখন ঝু প ঝা প শব্দ হয় বলিয়াই কি জঙ্গলের নাম ঝোঁ প? অথবা ঝু প শি আঁধার উহার ভিতর ঘনীভূত থাকে বলিয়া ঝোঁ প? ঝা প শা চোখে আঁধার দেখিতে হয়।

ঝর ঝর শব্দে ঝরণার জল ঝরিয়া পড়ে; সাধু ভাষায় উহা নির্ঝর। ঝারি হইতেও জল ঝরে। ঝির ঝির বা ঝুর ঝুর করিয়া বালি ঝরে; বালুকার কার্কশ্য বুঝাইতে ঝ'য়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ র বিদ্যমান। ঝাঁঝরা ও ঝাঁঝুরির সহস্র ছিদ্র দিয়া ধূলাগুঁড়া ঝরিয়া পড়ে। ঝর ঝর শব্দে যে সকল জিনিষ ঝরিয়া পড়ে, তাহাকে বাছিয়া লইতে হইলে ঝাড়িতে হয়। ঝাড়িবার যন্ত্রের নাম ঝাড়ন। ঝাড়ু-দার ধূলা ঝাড়িয়া ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন করে। ডালপালা ঝুরিয়া সেইরূপ বৃক্ষশাখাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। রাগের মাথায় গালাগালি দিয়া মনের মলামাটি সাফ করার নামও ঝুরিয়া দেওয়া। ঐ কাজে একবার প্রবৃত্ত হইলে ঝোরা অনেক সময় ঝগড়ায় পরিণতি পায়। ঝগড়া কর্ম্মটা ঝকমারি কর্ম্ম। ডাল-পালার শব্দ হইতে গাছপালার ঝাড়; গৃহসজ্জার্থ কাঁচের ঝাড় ও তদ্বৎ। জঙ্গলের মধ্যে ঝাড়ে ঝোরে শিকারী জন্তু লুকাইয়া থাকে।

জলজলের চঞ্চল দীপ্তি ঝলমলেও আছে। ঝিলমিলির কাঠের গায়ে ঢেউ খেলার চাঞ্চল্য আছে। শ্মশানের ঝিল কি চিতাগ্নির দীপ্তি মনে করায়? জলাভূমি ঝিলের অর্থ কি? ঝুলন দড়িতে দোল খাওয়ায় বা ঝোলাতে কেবলই চাঞ্চল্য আছে। মাকড়সার জাল আপন ভারে ঝুলিয়া ঝুল হইয়া পড়ে। তারল্যবশে যাহা আপনা হইতে ঝুলিয়া পড়ে তাহা ঝোল; তরল গাঢ় রক্ত ঝলকে ঝলকে নির্গত হয়। ধাতুময় তৈজস পাত্র রাঙের ঝাইল দিয়া ঝালান হয়; ঐ ঝাইল গাঢ় দ্রবাবস্থায় থাকে। মহাদেবের কাঁধে সিদ্ধির ঝুলি ঝুলিত। ঝালর ও ঝুলিয়া থাকে, উহার উজ্জ্বলতাও আছে। ঝুমকো ফুল উজ্জ্বলও বটে, ঝুলিয়াও পড়ে। স্ত্রীলোকের চুল বেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিলে কি উহা ঝুঁটি হয়? ষাঁড়ের পিঠের ঝুঁটের সহিত স্ত্রীলোকের মাথার ঝুঁটির সাদৃশ্য আছে কি? ঝুরির সহিত

ঝুলির অনেক বিষয়ে মিল আছে। ঝাঁকাড় দেওয়া বা ঝাঁকড়ান চঞ্চল আন্দোলনের নামান্তর; ভারী জিনিষকে ঝাঁকড়াইয়া লইতে হয়। জয়তী বেশে অন্নদার ঝাঁকড় মাকড় চুলও এখানে স্মর্ত্তব্য। ঘোষযুক্ত বর্ণ ঝ'য়ের ভার এস্থলে ধ'য়ের ভার ও ঢ'য়ের ভার স্মরণ করাইয়া দেয়। ঝাঁ করিয়া চলা আর ধাঁ করিয়া চলা তুল্যার্থক। ঝিমান (তন্দ্রা) কার্য্যে ঢিম। অর্থাৎ আলসে মানুষের ঢুলুঢুলু আঁখি মনে আনে। ঝোঁক, ইংরেজিতে যাহাকে impulse বলা যাইতে পারে, তাহাতে বেগবত্তার ও গুরুত্বের ভাব আসে। দায়িত্বের গুরু ভারের নাম ঝুঁকি। গুরুভার বোঝা বহিবার জন্য ঝাঁকার উৎপত্তি। পাখী যখন বৃহৎ দল বাঁধে, তখন সেই দলের বৃহত্তা বুঝাইবার জন্য বলি পাখীর ঝাঁক।

ক-বর্গ

প-বর্গ হইতে চ-বর্গ পর্য্যন্ত চারি বর্গের অন্তর্গত চারি শ্রেণির ধ্বনি যেমন এক একটা বিশিষ্ট লক্ষণের সহিত যুক্ত, ক-বর্গের বর্ণগুলিতে সে রূপ সাধারণ লক্ষণ বাহির করা কঠিন। উহার প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ক

কাক, কোকিল, কুকড়া (কুক্কুট), কুকুর প্রভৃতির নাম উহাদের স্বভাবিক ডাক হইতে আসিয়াছে। কোকিলের কূজন (সংস্কৃত) উহার কুহু ধ্বনি হইতে। কা কা, ক্যাঁক্যাঁ, কোঁকোঁ, কেঁই-কেঁই, কেঁউ-কেঁউ, কককক ক্যাঁক ক্যাঁক, প্রভৃতি স্বাভাবিক ধ্বনি নানা স্থানে আমাদের পরিচিত। সংস্কৃত কেকা, কাকু ও বাঙ্গলা কাকুতি (কাকুক্তি?) অনুকরণজাত,

সন্দেহ নাই। ক কৃ ক কৃ শব্দ করার নাম ক কা ন। কি চ মি চ, কি চি র কি চি র, কি চি র মি চি র শব্দ বিবিধ জন্তুর পক্ষে প্রযোজ্য। কুকুরের বাচ্চাকে কু ৎ কু ৎ করিয়া ডাকিলে সে মহানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অগ্রসর হয়; সে কিন্তু জানে না যে কু ত্তা র বাচ্চা বলিলে গালি দেওয়া হয়।

কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইবার সময় জিহ্বামূল ক্ষণেকের জন্য উহার পথ রোধ করিলে ধ্বনি জন্মে ক। অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বোধ করি ক' উচ্চারণে সময় লাগে সকলের চেয়ে কম। দ্রুততা ও আকস্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণ মাত্রেরই প্রধান লক্ষণ; সর্ব্বত্র ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—প ট্ করে কাজ করা, চ ট্ করে চলা, চ প্ করে ধরা। ক-কারাদি ক চ্, ক ট্, ক প্ প্রভৃতি শব্দেও ঐ দ্রুততা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে।

ক চ করিয়া কাটা ও ক ট করিয়া কাটাতে আবার অর্থের ভেদ আছে; কাগজের মত নরম জিনিষ কাটিলে ক চ হয়, আর তারের মত কঠিন ধাতব দ্রব্য কাটিলে ক ট হয়। ক'য়ের পর তালব্য বর্ণ বসিয়া কোমলতা ও মূর্দ্ধন্য বর্ণ বসিয়া কাঠিন্যের সূচনা করে।

ক চ, ক চ ক চ, ক চ র ক চ র, কু চ কু চ, কু চু র কু চু র, কঁ্যা চ কঁ্যা চ প্রভৃতিতে কাগজ, কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতি কোমল দ্রব্য কাটার ধ্বনি আসিতেছে। অন্নপূর্ণাদত্ত পিষ্টক মহাদেব ক চ ম চি য়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ইতি ভারতচন্দ্র। কঁ্যা চ শব্দে যে যন্ত্রে কাটা যায়, উহা কাঁ চি। যাহা কাটিবার সময় ক চ শব্দ হয়, তাহা কাঁ চা। কাঁ চ কে। মাটি শক্ত মাটি, উহা কঁ্যা চ করিয়া পায়ে বিঁধে। কু চ কি কোমল অঙ্গ, সহজেই সেখানে ব্যথা হয়। ছোট নরম জিনিষকে ক চি বলে; ক চু র কচুত্ব এবং ক চু রি র কচুরিত্ব কি কোমলতা হইতে? সংস্কৃতে কুঞ্চন শব্দ থাকিলেও বলিব যে কাপড়ের মত কোমল জিনিষই কোঁ চা ন যায়; বস্ত্রের যে অংশ কুঞ্চিত হয়,

তাহা কোঁচা; কোঁচার এক অংশ কুঞ্চিত হইয়া কোঁচড় হয়। বেতের মত স্থিতিস্থাপক জিনিষও কোঁচকান চলে; সেই জন্যই বাঁশের শাখার নাম কঞ্চি। কচলান ক্রিয়াও কোমলতা বা তারল্যের সূচক; কঠিন দ্রব্য কচলান হয় না। কোমল কাপড়ই জলে কাচা যায়; উহা কচলানর অনুরূপ। যে মানুষকে কচলাইতে হয়, তাহার কঁ্যাচলাম বিরক্তিকর। বালি যদি খুব সরু হয় এবং ভিজা হয়, তবেই কিচকিচ করে, অন্যথা কিচিড় কিচিড় করে। কুচ কুচ করিয়া কাটিয়া যে ছোট টুকরা পাওয়া যায়, তাহাকে কুচি বা কুচো বলে, যেমন কাঠের কুচো। কুচিকুচি ক'রে কাটার অর্থ ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা। কুচকুচ করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করার নাম কুচোন। কুঁচ এর ছোট বীজ সংস্কৃত গুঞ্জা হইতে আসিয়াছে, কি কুঁচ সংস্কৃত হইয়া গুঞ্জায় পরিণত হইয়াছে, বিচার্য্য বটে।

তালব্য চ'য়ের মত দন্ত্য বর্ণ ত'ও কোমলতাসূচক। ক'য়ের সহিত দন্ত্য বর্ণ ল' যুক্ত হইয়া কোমলতা ও তরলতার সহিত চাঞ্চল্য সূচনা করে।

হোঁদল-কুৎকুতের কুৎকুৎ শব্দ ঐ জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কি পরিচয় দেয়, তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। বগলে কুতুকুতু দিলে সর্ব্বশরীরে যে আক্ষেপ ও চঞ্চল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। খাদ্যদ্রব্য গিলিবার কালীন কোঁত শব্দের সহিত সংস্কৃত কুন্থনের সম্পর্ক থাকিতে পারে। কোঁতকা শব্দ বোধ হয় ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত কুর্দ্দন বা কোদা শব্দের সহিত ঐরূপ আক্ষেপের সম্পর্ক আছে কি ?

কলকল, কুলকুল চঞ্চল জলপ্রবাহের ধ্বনি। কালিন্দী জলের কল্লোলে যে কোলাহল উৎপন্ন হইত, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত পর্য্যন্ত কুতূহলী ছিলেন ও আছেন। সংস্কৃত নাটকের

নেপথ্যে কলকল ধ্বনির সহিত বাঙ্গলা কিলকিল ও সংস্কৃত কিলকিলার সম্পর্ক আছে। কিলবিল কিলকিলেরই অনুরূপ; অধিক জনতায় কিলকিল শব্দ হয়; মানুষগুলাও সেখানে কিলবিল করে। 'কোটি কোটি কাণ কোটারির কিলিবিলি'—এখানে কাণ কোটারির বাহুল্য বুঝাইতেছে। কল ধ্বনির মাধুর্য্য কালিন্দীজলের কল্লোলের মধুরতার সমান। পাখীর কাকলিও ঐরূপ মধুর। কোকিলের কূজন ত মধুর বটেই। কুল্‌লো করিবার সময় মুখের ভিতর জল কুলকুল করে। চঞ্চল আন্দোলনপরতা হইতে কি শূর্পের বাঙ্গলা নাম কুলো।?

অল্পপ্রাণ প-বর্ণ ক'য়ের পরে বসিয়া উহার দ্রুতগতিকে দ্রুততর করিয়া তোলে। কপ ক'রে, কপকপ ক'রে, কুপকাপ ক'রে খাওয়াতেই তাহার পরিচয়। কপ ক'রে কোপ দিয়া এক কোপে কাটার নাম কোপানু।

দন্ত্যবর্ণের যোগে যেমন কোমলতা বুঝায়, মূর্দ্ধন্য যোগে তেমনি কাঠিন্য আনে। লোহার তার কট্‌ শব্দে ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া যায়। ইঁদুর তাহার ছোট শক্ত ধারাল দাঁতে যখন কাঠ কাটে, তখন কুটকুট, কুটকাট, কুটুর কুটুর, কুটুর্ কাটুর, শব্দ হয়; ধারাল দাঁতের তীক্ষ্ণতাও ঐ কুটকুট ধ্বনিতে প্রকাশ করে। পিপাঁড়ায় কুট করিয়া কামড়ায়, এখানে বস্তুতঃ কোন শব্দ হয় না; কামড়ের তীক্ষ্ণ বেদনা বুঝাইতে এখানে কুট শব্দের প্রয়োগ। গায়ে বিছুটি লাগিলে গা কুটকুট করে, উহাও সেই বেদনার তীক্ষ্ণতার পরিচয় দেয়। কুটকুট কামড়ের প্রকারভেদ কুটুশকাটুশ কামড়। স্নায়বিক বেদনায় কটকটানি যন্ত্রণা জন্মে। কটের বিকার কটাং এবং কটাস। সরু তার দিয়া আঙ্গুল বাঁধিলে উহা কট করিয়া কাটিয়া বসিয়া কটকটানি জন্মায়; সরু অথচ কঠিন দ্রব্যকে কটকটে বলে। সংস্কৃত

কটু আস্বাদের কটুত্ব কি সেইরূপ কোন বেদনাজ্ঞাপক? কঠিন ব্রত পালনের নাম কটকিনা। কোটা (কুট্টন),—যথা চিড়ে কোটা,—এই ক্রিয়ার নাম কি ঢেঁকিযন্ত্রের অবয়বের কাঠিন্যজ্ঞাপক? কাঠের (কাষ্ঠের) ঠকার উহার কাঠিন্যজ্ঞাপক করে না, তাহা কিরূপে জানিব? তাই যদি হয় তবে কাষ্ঠ, কঠোর, কঠিন, কুঠার, কঠিনী, কটাহ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলির অন্তর্গত মূর্দ্ধন্য ধ্বনি উহাদের কাঠিন্য সূচনা নিশ্চয় করিতেছে। কঠিনার্থক কড়া, কড়ি, কাঠি, কুড়ুল, কটিং প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূলক হইলেও এই হিসাবে *কাঠিন্যব্যঞ্জক হয়।* *এমন* কি কূট ও কুটিল, কোটর ও ক্রূর প্রভৃতি শব্দেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সংস্কৃত কৃৎ ধাতু—যাহার অর্থ কাটা এবং যাহা হইতে কর্ত্তন, কর্ত্তরী (কাটারি) প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন, তাহাও বুঝি বা এই শ্রেণিতে পড়ে।

সংস্কৃত শব্দের মূল যাহাই হউক, করকর, কিরকির, কুর কুর প্রভৃতি শব্দ কঠিন কর্কশ দ্রব্যের বার্ত্তা বহন করে। কড়কড়, কিড়কিড় প্রভৃতি শব্দও উহারই রূপান্তরমাত্র। কিড়মিড়, কিড়ির মিড়ির দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের শব্দ। কর্কশ, কর্কর, (কাঁকর), কর্কট (কাঁকড়া), কর্পট (কাপড়), কর্পর প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দেও কি সেই ভাব আসিতেছে না?

সোণার কঙ্কণ (কাঁকনি) তাহার নামের অনুনাসিক ধ্বনিতে উহা যে ধাতুনির্ম্মিত, তাহার পরিচয় দিতেছে। ধাতুনির্ম্মিত সরু তারের শব্দ কন্‌কন্; ঐ ধ্বনির তীব্রতা এবং ঐ তারের তীক্ষ্ণতা কনকনানি, কুনকুননি প্রভৃতি বেদনাজ্ঞাপক শব্দে বিদ্যমান। কন্‌কনে শীতে যে বেদনা বুঝায়, উহা সরু তারে চামড়া কাটিয়া গেলে তদুৎপন্ন বেদনার বা যাতনার অনুরূপ। কাল রঙের কিশকিশে বিশেষণ ক-কারাদি কেন?

খ

খ বর্ণ ক'য়ের মত জিহ্বামূলীয়,—উহার জোর ক'য়ের চেয়ে অধিক। খক্, খক্‌খক্ প্রভৃতি কাশির শব্দ কণ্ঠ হইতে জিহ্বামূল সহযোগে উৎপন্ন—কাশির নাম খকি। হাঁসির শব্দও জিহ্বামূলে উৎপন্ন, যথা খিক্ খিক্, খুকখুক,—ল-কার যোগে উহা চঞ্চল হইয়া খল্‌খল, খিলখিল ইত্যাদি হাস্যতরঙ্গে পরিণত হয়। খুকখুক হাসে বলিয়া কি শিশুর আদরের নাম খোকা ও খুঁকী? খেউ খেউ, খেঁকখেঁক ডাক হইতে খেঁকি কুকুর ও খেঁক্-শিয়াল তাহাদের বিশেষণ পাইয়াছে। খেউ খেউ শব্দে বিরক্তিকর ও অশ্রাব্য গানের নাম কি খেউড়? না, উহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে? খ্যাঁক্‌খেঁকে মানুষ সর্ব্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন খেঁক খেঁক করে।

কচ্ শব্দ জোরে উচ্চারিত হইয়া খচ, খচখচ, খ্যাঁচ, খ্যাঁচ খ্যাঁচ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ছোট কাঁটা চামড়ায় প্রবেশ করিয়া খচখচ, খুচ খুচ, করে; উহার ফল খুচ কি নড়া। জোরে টানার শব্দ খ্যাঁচ; খেঁচানর অর্থ জোরে টানা; দাঁত খেঁচানর অর্থ ওষ্ঠাধরের আচ্ছাদন জোরে টানিয়া লইয়া বা খেঁচিয়া দন্ত বিকাশ। ধনুষ্টঙ্কারে হাত পায়ের সবল আন্দোলন খেঁচুনি। বেত বা বাঁশ চিড়িয়া তন্নির্ম্মিত খাঁচা, খাঁচি, খুঞ্চি, ঐ ঐ স্থিতিস্থাপক পদার্থের খেঁচান জ্ঞাপক। খুচ শব্দে যে কাঁটা বিধিয়া যায়, তাহার নাম খোঁচা। বল্লমে বেঁধার নাম খোঁচান। গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা খেঁচিয়া সরাইতে হয়, উহা খিঁচ।

কুচো, কুচি প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড খণ্ড জিনিষের ছোট টুকরা বুঝায়; খুচরা শব্দেও ঐ খণ্ডতার ভাব আনে।

ধূলা ও বালির কিচকিচি যেমন বিরক্তিকর, তেমনি কাজকর্ম্মে খিচখিচি, খিচবিচি, খিচমিচি, ঘটিলে উহাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

খট, খটখট, খিটখিট, খটমট, খুটখাট, খুটমুট খুটখুট, প্রভৃতি শব্দ কাঠিন্যের ব্যঞ্জক। কট্ ও টক্ এই দুই শব্দের অনুরূপ শব্দ খট্। শুকনো জিনিষ কঠিন খটখটে। খিটখিটে মানুষের মেজাজ কঠিন বা কর্কশ। খাঁটি মানুষের স্বভাব কঠিন বটে; অন্ততঃ উহা উৎকোচে নোয়ায় না। খটি বা খড়ির নামের সহিত তাহার কাঠিন্যের সম্পর্ক আছে। খাট (খট্টা) উহার কঠিন কাষ্ঠময় উপাদান হইতে নামকরণ পাইয়াছে কি না বিবেচ্য। খাটের খুড়ো ত কঠিন কাষ্ঠময় বটেই। খড়ম উহার কাষ্ঠময়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ করিবার হেতু নাই। চলিতে চলিতে খট শব্দে চরণদ্বয় কঠিন বাধায় আহত হইলে থামিতে হয়; খটকা লাগার অর্থও ঐরূপে আহত হইয়া থামিয়া যাওয়া। খাট জিনিষের খর্ব্বত্বের সহিত কাঠিন্যের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি? খাট্টা রস ও খোট্টা মানুষ কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহো নাস্তি, বিশেষতঃ কাঠ-খোট্টার কাঠিন্যে। খাটুনি কঠিন কাজ বটে। খাড়া হইয়া দাঁড়ান কঠিন মেরুদণ্ডের পক্ষে সম্ভবে। খুঁটি জিনিষটাও কঠিন কাষ্ঠের উপাদানে নির্ম্মিত; উহা ছোট হইলে খুঁটে। হয়; খুঁটো মোটা হইয়া মুদ্গারে পরিণত হইলে হয় খোঁটা। খুঁটোর রূপভেদ খুরো, যেমন খাটের খুরো। অথবা উহা সংস্কৃত খুর হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে। ছোট ছোট খুরোর উপর যাহা বসিয়া থাকে, তাহা খোরা ও খুরি। খুটখুট শব্দের মত বিরক্তিকর কর্ম্ম খুঁটোনি। খুটিনাটি কাজও তদ্রূপ। খটাং, খটাস প্রভৃতি খট শব্দেরই বিকার। কলঙ্কসূচক খোঁটা ও

খি ট কা ল মনুষ্য চরিত্রে খ ট শব্দে আঘাত দেয়। দাঁতের খা ম টি মুখভঙ্গীর কাঠিন্যসূচক।

খ ট খ টে র কাঠিন্য কার্কশ্যে পরিণত হইলে খ র খ র, খু র খু র, খ ট র খ ট র, খু র খা র, খু টু র খু টু র, খু টুর মু টুর, খু টু র খা টু র, খ র র খ র র, খু রু র খু রু র প্রভৃতি শব্দে পরিণত হইয়া থাকে। খ র খ রে, খ র ম রে জিনিষের অর্থই কর্কশপৃষ্ঠ জিনিষ। এই কার্কশ্য হেতু কি শুষ্ক তৃণের নাম খ ড়? খড়ের টুকরা হইতে দাঁতের খ ড়কে প্রস্তুত হয়। জানালার ঝিলমিলির নাম খ ড় খ ড়ি ধ্বনিজাত। অলঙ্কার খা ড়ু আর খে ড়ুয়া বস্ত্র কি কার্কশ্যসূচক?

ক প্ শব্দ জোরে খ প্ হয়। খ প, খ প খ প, প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়ার দ্রুততা ও আকস্মিকতা বুঝায়। খ প্ করিয়া আমরা খা ব ল দিয়া খা ব লা ই। তাড়াতাড়ি কোন কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার ঔৎসুক্য খ প খ পা নি। খা পে র ভিতর তলোয়ার হঠাৎ খ প করিয়া বসে বা খা পি য়া বঁসে বা খা প খায়। খা প্পা মানুষের ক্রোধের আকস্মিকতা খ প শব্দের দ্রুততা বুঝায়।

পোড়া মাটির শব্দ খ ন খ ন। হাঁড়ী কলসী, মালসা প্রভৃতি পোড়া মাটির জিনিষে আঘাতের শব্দই খ ন্ খ ন্। খ'য়ের ধ্বনি ঐ সকল দ্রব্যের বিশিষ্টতা। খা প রা (খর্পর), খা প রে া ল, খো লা; (কপাল) খু লি, খো ল (বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত খ' কি ঐ সকল দ্রব্যের মৃণ্ময়ত্ব সূচনা করিতেছে? কলসীর বায়ুপূর্ণ গর্ভদেশ প্রতিধ্বনিতে খাঁ খাঁ শব্দ করে; খাঁ খাঁ ধ্বনি কি এইজন্য শূন্যতাসূচক? জনশূন্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে রুদ্ধ বায়ু প্রতিধ্বনিতে খাঁ খাঁ করে। যাহার ভিতরটা শূন্য, তাহা খাঁ কে পরিণত হয়। অঙ্গার লঘু ভস্মে পরিণত হইলে খাঁ ক হয়। খাঁ কি রঙ কি ভস্মের বর্ণ? কুলাঙ্গারকে সেকালের কবিগণ কুলের খাঁ কা র বিশেষণ

দিতেন। খোলের অভ্যন্তর শূন্য বটে; বিছানা বালিসের খোল খুলিতে হয়। কোন কর্ম্মের অভ্যন্তরে উপযুক্ত হেতু না থাকিলে ঐ ফাঁকা কাজটা খামখা হয়। যে খনখন করিয়া নাকিসুরে কথা কয়, সে খোনা। খঞ্জনীর অনুনাসিকতা তাহার ধাতুময়ত্বের পরিচয় দিতেছে।

খুঁতখুঁতে, খুতমুতে লোক যেন সর্ব্বদাই খুঁতখুঁত করে, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। খুঁত ধরার অর্থ ছল গ্রহণ। খস্ শব্দে খোসা ও খোলস খসিয়া পড়ে। খোস পাচড়ার ঘা শুকাইলে উহা হইতে খুসকি উঠে। খসখসে বা খোসকো জিনিষের কর্কশ পিঠ হইতে খোসা উঠে। খিসখিস শব্দ বিরক্তিসূচক; বিরক্ত লোকের খিস হয়। খসখস শব্দ হইতে বেনা ঘাসের মূলের নাম খসখস।

গ

ঙ'য়ের যেমন ঙাঁক, গ'য়ের তেমনি গাম্ভীর্য্য। উভয়েই বর্গের তৃতীয় বর্ণ কি না!

গোঁ গোঁ, গাঁগাঁ, গন্ গন্, গম্‌গম প্রভৃতি গুরুগম্ভীর শব্দ। বাঘের ডাক গাঁক্। যন্ত্রণায় নরকণ্ঠ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইলে গেঙানি, গোঙানি, গোঙরানি হয়। গোঁ ধরার ভাবটাই গাম্ভীর্য্যসূচক। গুম ধরাতেও ঐ ভাব আসে। পিঠে গুমাগুম কিল প্রয়োগের গুরুত্ব স্পষ্ট। গুমট, গুমর, গতর, গুমগুনি প্রভৃতি শব্দ গাম্ভীর্য্য সূচনা করে। মধুকরের গুনগুন (গুঞ্জন) শব্দে ততটা গাম্ভীর্য্য নাই; সে উ-কারের গুণে। কিন্তু মানুষ যখন রাগে গনগন করে, অথবা আগুন যখন গমগম করে, তখন উহার গাম্ভীর্য্যে সন্দেহ থাকে না। দ্বিধা-সূচক গাঁই

গুঁই আচরণের গুরুত্ব-প্রকাশক। সন্দেহ জন্মে যে গু রু, গ ভী র, গ ম্ভী র, প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দের আদিস্থিত গ-কারও হয় ত ঐ ভাব আনিতেছে। গু ন গু ন শব্দেই যখন গানের আরম্ভ, ও নরকণ্ঠের ধ্বনি যখন জিহ্বামূল স্পর্শে সহজেই গঁ্যা গোঁ তে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত গানের মূল গৈ ধাতুর গ-কারও কি ঐ মূল হইতে আসিয়াছে? গ্রী বা, গ ল, গ ণ্ড প্রভৃতির আদিস্থিত গ-কারও সন্দেহজনক। গানের গ তে র গকার কি ঐ জন্য। গ দ গ দ বাক্যে স্বরের গাম্ভীর্য্য আছে বটে।

গোঁ। বশতঃ যে গুরু আঘাত, তাহার নাম গুঁ তা। গ ট হইয়া বসিয়া থাকায় একটা কঠিন অথচ গম্ভীর ভাব আছে; যে ঐ ভাবে বসে, সে যেন আপনার দেহটাকে কাষ্ঠ-প্রতিমার মত কঠিন করে, উহাকে সহজে নোয়ান যায় না; ঐ কাঠিন্য অবশ্য গ'য়ের পরবর্ত্তী ট' হইতে। গ ট গ ট করিয়া চলা যেন কাঠের উপর দিয়া শব্দ করিয়া দম্ভের সহিত চলা। উ-কার যোগে গ ট গ টে র জাঁক কমিয়া গু ট গু ট হয়। গু ট করিয়া যাহা পতিত হয়, তাহা গু টি; মোটা গু টি হয় গো টা। গি র গি টি জন্তু গি ট গি ট করিয়া চলে, না, গি ট গি ট করিয়া ডাকে?

গ র গ র, গু র গু র, প্রভৃতি শব্দ কর্কশ; ঐ কার্কশ্যেও যেন গম্ভীর আওয়াজ আছে। জলের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালনেও ঐ শব্দ হয়; ধূমপায়ীর গ ড় গ ড়া ও গু ড় গু ড়ি ঐ ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। ঐরূপ শব্দের সংস্কৃত নাম গর্জ্জন; মেঘের গ র গ র, গু র গু র শব্দ মেঘগর্জ্জন। গ ড় গ ড় শব্দে গ ড়া ৎ করিয়া গতির নাম কি গ ড়া ন? গ ড় গ ড় শব্দে যাহা হইতে জল পড়ে, তাহাই কি গা ড়ু? গ ড় গ ড় শব্দে কর্ণপীড়া দিয়া চলে বলিয়া কি গা ড়ী?

রাগে যেমন, গা গ ন গ ন করে, তেমনি গ শ গ শ করে, গি শ

গিশ করে। রাগে গশগশ করার নাম কি গোশা করা? না, উহা ফার্সী শব্দ?

খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের শব্দ গপ বা গব; তাড়াতাড়ি অভদ্র ভাবে খাওয়া গবগব, গবাগব করিয়া গেল। ছোট ছোট গ্রাস গুবাগুব গেলা যায়।

ল-কার যোগে অন্যত্র যেমন, এখানেও সেইরূপ তরলভাব উপস্থিত হয়। গলগল, গিলগিল করিয়া তরল দ্রব্যের ধারা বহে। গলিত হওয়া সংস্কৃত শব্দ, উহার মূলও কি ঐখানে?

কোমল তালব্য বর্ণ-যোগেও গ-কারের গাম্ভীর্য্য একবারে যায় না। গচি মাছ বোধ হয় তাহার আকৃতির তুলনায় গুরুভার মাছ। গজগজ, গজমজ, গিজগিজ, গিজগাজ, গিজমিজ, ও গুজগাজ, গুজগুজ, গুজুর গুজুর ইত্যাদি শব্দ পরামর্শের গম্ভীরতার পরিচয় দেয়। স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা গাঁজায় পরিণত হয়; শূন্য স্থানে কোন দ্রব্য গুঁজিয়া দিলে উহার গুরুত্ব বাড়ে; যাহা গোঁজা যায়, তাহা গোঁজ। ব্রণের উপরে গ্যাজের গুরুত্ব স্পষ্ট। খেজুর রস গেঁজিয়া উঠিয়া স্ফীতি পায়। পুকুরে মাছ ঐরূপে গেঁজিয়া উঠে। গাঁজার দমে গঞ্জিকাসেবীর গম্ভীরতা বাড়ে নিশ্চয়।

দন্ত্যবর্ণ যোগে গ-কার কোমলতা পায় বটে, কিন্তু ঐ দন্ত্যবর্ণ ঘোষবান্ দ-কার হইলে কোমলতার সহিত গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গদ, গদগদ, গ্যাদগ্যাদ প্রভৃতি শব্দেই তাহার প্রচুর পরিচয়। গাদের কোমলতা ও গুরুতা উভয়ই স্পষ্ট। গাদা ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐ কথা। গদি কোমল বটে, গুরুভারও বটে। পালের গোদা কিন্তু গৌরবেই গুরু। বানরের পালে মোটাসোটা পুরুষগুলাকেই গোঁদা বলে। গোদা পায়ের গোদ সংস্কৃত গণ্ড হইতে আসিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কি?

ঘ

ঘ'য়ের ধ্বনি যে গম্ভীর ও ঘোষবান্, তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত—ভারতচন্দ্রের 'ঘর্ঘর্ঘর্ঘোর-নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ'। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষের কথা মহাকবির উক্তি। সংস্কৃত ঘন, ঘোর, ঘোষ, ঘর্ম্ম, ঘট্ট, ঘরট্ট প্রভৃতি শব্দের আদিতে ঘ-কার কেন? ঘেউ ঘেউ শব্দ খেউ খেউয়ের তুলনায় গম্ভীর। গেঙানির চেয়ে ঘেঙানি গম্ভীর। ঘ্যানঘ্যান, ঘিনঘিন প্রভৃতিতে একটা গভীর বিরক্তির ও ঘৃণার ভাব আসে। ঘানি গাছের গুরুগম্ভীর শব্দ ঘ্যানর ঘ্যানর। বুনো শূয়োর গম্ভীর ভাবে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করিয়া চলে। ঘুঘু পাখী ঘুঘু শব্দে ডাকে। বাঘের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোগের ডাক কিরূপ?

গলার ঘরঘর শব্দ দুর্ব্বল হইয়া ঘুরঘুর শব্দে দাঁড়ায়। ঘটঘট, ঘটমট, ঘুটঘাট, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘটরঘটর, ঘটরমটর ইত্যাদি শব্দে কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে। চূণের মাটি কঠিন দানা বাঁধিয়া ঘুটিং হয়।

ঘণ্টা ও ঘুন্টি এরং দুই শব্দের মধ্যস্থ ন-কার ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে।

ঘুরঘুর ধ্বনির জন্য কি ঘূর্ণন গতির বাঙ্গলা ঘোরা? ঘুরঘুরে পোকা ঘুরঘুর শব্দ করে, না, ঘুরঘুর করিয়া ঘোরে? ঘুরঘুর বা ঘুরুর ঘুরুর করিয়া ঘোরা এবং সর্ব্বদা কাণের কাছে ঘুসুর ঘুসুর করা সমান বিরক্তিজনক। কাণের কাছে ঘুসুর ঘুসুর করিয়া অপরের নিন্দাবাদের গ্রাম্য নাম ঘউচর। ঘষাঘষ শব্দের সহিত সংস্কৃত ঘর্ষণের (ঘষার) কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে করা

কঠিন। কঠিন দ্রব্যের গায়ে ঘষার নাম ঘ স টা ন। গা ঘেঁষিয়া চলিলে গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হয়। ঘাঁটা আর ঘষা বা ঘসটা প্রায় তুল্যার্থক। তরকারির ঘণ্ট কি ঘাঁটিয়া প্রস্তুত হয়? সিদ্ধি ঘুটিবার সময় ঘুটঘাট শব্দ হয়। ঘোঁট পাকাইবার সময় মানুষে মানুষে কঠিন ঘর্ষণ অসম্ভব নহে। ঘষঘষ ছোট হইয়া ঘুষঘুষ হয়; ঘুষঘুষে জ্বর অল্পমাত্রায় জ্বর,—যাহা সহজে ছাড়িতে চায় না। ঘষরঘষর শব্দ বন্ধুর দ্রব্যে ঘর্ষণ বুঝায়। ঘাঘরা ও ঘাঘরি বসন ঐ নাম পাইল কেন?

খোঁচা গুরুত্ব পাইয়া ঘোঁচা হয়। ঘোঁচানি আর ঘেঁতানি প্রায় তুল্যার্থক।

ঘুপশি বা ঘুপচি বা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার গভীর অন্ধকার। তরল দ্রব্য গলগল করিয়া পড়ে; গাঢ় হইলে উহা ঘলঘল করিয়া পড়ে। জলে কাদা গুলিয়া উহাকে গাঢ় করিলে জল ঘোলা হয়। দুধের ঘোল তরল গাঢ় ঘোলা জিনিষ। সবল ব্যক্তি জোরে আঘাত পাইলে ঘাল হইয়া পড়ে।

অন্তঃস্থ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণ

য়, র, ল, ব, এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে য় ও ব অনেক বিষয়ে স্বরের লক্ষণযুক্ত; বাঙ্গলায় ঐ দুই বর্ণ শব্দের আদিতে বসিতে চায় না। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয় শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ য'কে বর্গীয় জ'য়ে এবং অন্তঃস্থ ব'কে বর্গীয় ব'য়ে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজিতেও y ও w এই দুই বর্ণ শব্দের আদিতে বসিলে ব্যঞ্জন বর্ণ রূপেই গৃহীত হয়। কাজেই খাঁটি বাঙ্গলায় শব্দের আদিতে ঐ দুই বর্ণের [illegible] মিলিবে না। র ও ল এই দুই বর্ণ শব্দের আদিতে প্রযুক্ত হয় বটে। র-কারাদি দৃষ্টান্তও বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। দূর হইতে ডাকিতে হইলে আমরা রে,

অ রে, ও রে বলিয়া ডাকি। র মূর্দ্ধন্য বর্ণ, অতএব উহা কঠোরতা ও কর্কশতা সূচনা করে। ও রে বলিয়া ডাকা কর্কশ ভাবে ডাকা; দৃষ্টান্ত, ভারতচন্দ্রের 'ওরে রে ওরে দুষ্ট দে রে সতী রে'। রৈ রৈ শব্দ কর্কশ কোলাহল। রিরি শব্দেও ঐ ভাব আছে। রিনিঝিনি, রুনুঝুনু প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলঙ্কার শিঞ্জিত মনে আনে; ঐ ন-কার র-কারের কার্কশ্য নষ্ট করিয়া ধ্বনিকে মোলায়েম করে। রগ, রগরগ, রগড়, রগড়ান, রপটান, প্রভৃতি কয়টি র-কারাদি কাঠিন্যসূচক শব্দ পাওয়া যায়; বড় বেশী পাওয়া যায় না।

দন্ত্য ল'য়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে। দন্ত্য বর্ণের ইহাই স্বভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুরুষ পুরুষকে ডাকে রে কিংবা ওরে বলিয়া, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে ডাকে লো এবং ওলো বলিয়া। বহুকাল হইতে এই রীতি বর্ত্তমান; শকুন্তলার সখীরা শকুন্তলাকে হলা শউন্তলে বলিয়া ডাকিতেন। রুটি কোমলতা পাইয়া কি লুচিতে পরিণত হইয়াছে? লক্‌লক্‌, লিক্‌লিক্‌, লিক-লিকে প্রভৃতি শব্দ তরল চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। সংস্কৃতে যাহাকে লোল জিহ্বা বলে, উহা লেলিহান হইয়া লক্‌ লক্‌ করে, তখন উহাতে লাল (সংস্কৃত?) নিঃসৃত হয়। উপাদেয় খাদ্য দেখিলে জিহ্বায় লাল পড়ে, উহার জন্য লালানি হয়। লচপচ তারল্যের ব্যঞ্জক; লোচ্চা অতি তরল প্রকৃতির মানুষ; সংস্কৃত লম্পট শব্দের বাঙ্গলা উহাই। 'লটপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা' এই বাক্যে মহাদেবের জটাজূটের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। লটলট, লটাং, লটাস্‌, লটঘট প্রভৃতিও ঐরূপ ভাবের পরিচয় দেয়। লিটপিটে লোকে কাজের শেষ করিতে পারে না; একই কাজে তরল পদার্থের মত আপনাকে জড়াইয়া কাল গৌণ করে বা লিটির পিটির

করে। লড়লড়, লড়বড়, লুরলুর, লপলপ প্রভৃতি এবং লশলশে, লিংলিঙে প্রভৃতি ল-কারাদি শব্দে তারল্য চাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্যের ভাব মিশ্রিত হইয়া আছে। লে লে শব্দে কুকুর লেলান হইতে একজন মানুষের পিছনে অন্যজনকে লেলাইয়া দেওয়া আসিয়াছে।

লাফ (লম্ফ) দেওয়া, লুফিয়া লওয়া, লুকিয়া থাকা, লুটিয়া চলা প্রভৃতির ল'য়ে ঐ ভাবের কোন সম্পর্ক আছে কি না, *বিচারের বিষয়।* লতার মত ও লূতার মত খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ল-কারাদিত্বও সন্দেহজনক। সংস্কৃতে বা বাঙ্গলায় যেখানে ল'য়ের বাহুল্য, সেইখানেই যেন আলুলায়িত কুন্তল অর্থাৎ এলো চুলের মত লটপট হইয়া এলিয়া পড়ার ভাব আসে। মধুর-রস-লোলুপ বৈষ্ণব কবিরা স্বভাবতই তাঁহাদের কবিতা মধ্যে কোমল দন্ত্যবর্ণের, বিশেষতঃ ন-কারের আর ল-কারের, ছড়াছড়ি করেন; নতুবা আমরা 'ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে', 'কলিন্দ-নন্দিনী-তটে ননন্দ নন্দ-নন্দনঃ', 'কালিন্দী-জল-কল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী', ইত্যাদি কবিতা পাইতাম না। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী-মধ্যেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে।

বাঙ্গলায় যুক্তবর্ণ ব্যতিরেকে অন্যত্র উষ্মবর্ণের ত্রিবিধ উচ্চারণ (শ, ষ, স) বজায় নাই; এই যুক্তবর্ণের অধিকাংশই আবার সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃত-মূলক শব্দ। খাঁটি বাঙ্গলায় ঐ তিন উষ্মবর্ণের পার্থক্য রাখার বিশেষ হেতু নাই। সেকালের পুঁথিপত্র লেখাতে এক স' তিনের কাজই চালাইত। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে স ও শ দুই ব্যবহার করিব।

বলা বাহুল্য যে উষ্মবর্ণ বিশেষতঃ বায়ুর চলাচল স্মরণ করাইয়া দেয়। বায়ুর সহিত উহার সম্পর্ক অতি নিকট। কণ্ঠনিঃসৃত বায়ু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া জিহ্বা ঘেঁষিয়া বাহির হইলে উষ্মবর্ণের উচ্চারণ হয়; বর্গীয়

বর্ণে যেমন বায়ুর গতি একবারে আটকাইয়া যায়, উষ্মবর্ণে কণ্ঠাগত বায়ুর গতি তেমন করিয়া কোথাও একবারে রুদ্ধ হয় না। অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাতাসের শব্দই সাঁ সাঁ, সোঁ সোঁ, সন সন, সাঁই সাঁই, সর সর, সুর সুর, সির সির, সিট সিট, সুট সুট, সুর সার। এই শব্দগুলি ভাষায় গৃহীত হইয়া নানা অর্থ প্রকাশ করে। সাঁ করিয়া চলা দ্রুতগতিতে বায়ুর সঞ্চালন মনে করায়। শ্বাসরোগীর গলা সাঁই সুঁই করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গা সিট সিট করে, চুলকানির পূর্ব্বে গা সুর সুর করে ইত্যাদি। অল্পপ্রাণ ট বর্ণ যোগে স' আকস্মিকতা বা দ্রুততার ভাব আনে; যেমন সট ক'রে চলা, সট সট বা সটাসট বেত মারা। সট করিয়া চলা বা পলায়ন অর্থে সটকান; নাক ঝাড়ার শব্দ হইতে নাক সিটকান। সপ, সপসপ, সপাসপ প্রভৃতি শব্দেও অল্পপ্রাণ প যোগে এইরূপ অর্থ। শলশলে অর্থে শিথিল; এখানে সেই কোমল ল আসিয়া শ'য়ের পরে বসিয়াছে। সোঁতা, স্যাঁতসেঁতে অর্থে আর্দ্র; এই তারল্য ত-কার হইতে। শুঁয়া পোকার শুম গায়ে লাগিলে গা শুম শুম করে; এখানে অনুনাসিক ধ্বনি তীক্ষ্ণতাব্যঞ্জক। শামশুম শব্দ খাঁখাঁ এবং ভাঁভোঁ শব্দের মত স্তব্ধতার বা শূন্যতার শান্তিবাচক। সীস দেওয়ার সময় প্রকৃতপক্ষেই সীসী শব্দ হয়।

হ

হ বর্ণটাকে ব্যঞ্জনের মধ্যে না ফেলিয়া মহাপ্রাণ অ-কাররূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে। ইংরেজিতে মহাপ্রাণ উচ্চারণ চলিত নাই। ক, গ, প প্রভৃতি অল্পপ্রাণ বর্ণকে খ, ঘ, ফ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে হইলে ইংরেজি k, g, p প্রভৃতির পরে একটা h অর্থাৎ হ বসাইয়া kh, gh, ph প্রভৃতির রূপে লিখিতে হয়। মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবত্তা, বলবত্তা,

স্থূলতা, সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান। কণ্ঠস্বর জোরে বাহির হইলে হুঙ্কারে বা হাঁকারে বা হাঁকে পরিণত হয়। যাহার হাঁক ডাক বেশী, তাহাকে লোকে ভয় করে। হাঁকা নামক জীব শিশু-জনের পক্ষে ভীষণ। বেদের হিঙ্কারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া বৌদ্ধেরা তাঁহাদের মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। হাঁ। হুঁ শব্দ কোন বিষয়ে সম্মতি দিবার অতি সংক্ষিপ্ত উপায়। গানের মজলিশে পাখোয়াজের বাজনার সঙ্গে হাঃ হাঃ শব্দের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য শুনা যায়। দূর হইতে কাহাকে ডাকিতে হইলে ওহে, হে বলিয়া ডাকা যায়। হা, আহা, হাঃ, হায়, হুঃ, উহুঃ, অহো, হো, প্রভৃতি অব্যয় বিস্ময় খেদ প্রভৃতি প্রকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়। আনন্দের সময় হাঃহাঃ, হিঃহিঃ, হুঃহুঃ প্রভৃতি শব্দ আপনা হইতে কণ্ঠনিঃসৃত হইলে উহাকে হাসি (হাস্য) কহে। শেয়ালের ডাক হুকি হুয়া, হুক্কা হুয়া ও হনুমানের ডাক হুপহাপ, গরুর ডাক হম্বা, উল্লুকের ডাক হুকু হুকু, হুতোম প্যাঁচার ডাক হুঁঃ হুঁঃ, বমনের শব্দ হক, খাবার গেলার শব্দ হপ বা হপা হপ ইত্যাদি স্বাভাবিক ধ্বনিমাত্র। রূপকথার রাক্ষসীর ডাক হাঁউ মাউ। ঝাউ বনের হাউ নিশ্চয় ঐরূপ ডাকিত। হাঁসির মত হাঁচি, হেঁচকি, হিক্কা, হাঁপ, হাঁপানি প্রভৃতি শব্দও স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণোৎপন্ন। কামারের হাপড় হইতে জোরে মুখব্যাদান করিয়া বা হা করিয়া হাঁই তুলিবার সময় কণ্ঠ হইতে বাতাসটা বাহিরে আসে; কিন্তু কোন কণ্ঠধ্বনি হয় না। নারীকণ্ঠের হুলু ধ্বনি হইতে ক্রুদ্ধ জনতার হল্লা পর্য্যন্ত অনুকরণোৎপন্ন। জোরে নিশ্বাস পড়িলে হাঁস ফাঁস শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর হাঁই ফাই করিতে হয়। গাড়ির এঞ্জিন হুসহুস, হসহস, হসমস, করিয়া চলে। হনহন করিয়া চলা বেগে চলা। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি

চেতনালাভ করিলে হুস শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; চেতনালাভের নাম হুঁস হওয়া। কামারের হাপড় হস্ হস্ শব্দে বায়ু উদ্গিরণ করে। ক্রন্দনের শব্দ হাপুস; আর স্নানের সময় জলে ডোবার শব্দও হাপুস। হৈহৈ করিয়া বেড়ান আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ; উহার রূপভেদ হৈ চৈ। আকস্মিক হেঁচকা টানে কোন জিনিষকে হেঁচড়িয়া লইয়া যাওয়া হেঁাতকা স্বভাবের কাজ; এই কাজে হ-কারের মহাপ্রাণতার পরিচয় পাই। হুঁকার ভিতরে নিশ্চয় একটা হুঙ্কার ধ্বনি গুপ্ত থাকে; তামাকখোর বলিবেন, উহা নিশ্চয় বেদের হিঙ্কারের অনুরূপ। হ্যাঁচ শব্দে নখ প্রয়োগে জোরে আঁচড় দেওয়ার নাম হাঁচড়ান। হটমট, হুটমুট, হুটুরমুটুর করিয়া হাঁটা যেন দন্তের সহিত কঠিন ভূপৃষ্ঠ দলিয়া চলা। হলহল করিয়া হেলা বা হালা আন্দোলনের বেগবত্তার পরিচায়ক। হেলে বা হেলহেলে সাপ হেলিয়া চলে। বন্ধুর ভূপৃষ্ঠের উপর টানিলে হরহর, হরমর, হরবর, হুরমুর ইত্যাদি কর্কশ ধ্বনি হয়। অস্থির বাঙ্গলা নাম হাড় কি উহার কাঠিন্যজ্ঞাপক? হাড়ী জাতি কি এককালে হাড়ের ব্যবসায় করিত? হঠাৎ, হেঁটকা, হুরকো, হেরফের, হিমশিম, হুটোহুটি, হুটোচুটি, হঁপহপ, হপহপ, হুড়ুমহাড়ুম, হুড়ুমধুম, হনহন, হানাহানি, হুমরো চুমরো, হুমুরি, হলকা, হালকা, হিজিবিজি, হাবলা, হাবুডুবু, হাঁটু, হেঁট, হামার, হামরাই, হুমকি, হাঙ্গামা, হুজ্জত, হুজুগ, হুবহু, হুবাহুব, হোঁচট, হাঁদা, হস্তিকাল, প্রভৃতি অগণ্য হ-কারাদি শব্দ মহাপ্রাণ হ-বর্ণের বলবত্তা বেগবত্তা ও স্থূলতা বহন করিতেছে। শিশুরা হুট্টু হুটু হুটুরি বলিয়া এক পায়ে নাচে আর লাফায়; বালকেরা হাডুডুডু শব্দে খেলা করে।

বাঙ্গলা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য যেএই আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। বহু স্থলে হয়ত কষ্টকল্পনারও অভাব হয় নাই। ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় না লইলে উপায় নাই। বড় বড় ভাষাতাত্ত্বিকেরাও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনাকে উধাও ভাবে উড়িতে ও খেলিতে দিয়া থাকেন। এদেশের প্রাচীন শাব্দিক পণ্ডিতই বল, আর পশ্চিমদেশেয় আধুনিক শাব্দিকই বল, কল্পনার সাহায্য বিনা কাহারও এক্ষেত্রে চলিবার উপায় নাই। কাজেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে সদাই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সংস্কৃত দু হি তা শব্দ স্পষ্টতঃ দোহনার্থক দু হ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন; যে দো হ ন করে, সেই দুহিতা। আমাদের ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিবেন, কন্যা পিতার ধনসম্পত্তি দোহন করেন, সেইজন্য তিনি দুহিতা। পাশ্চাত্য শাব্দিক বলিবেন, ঐ শব্দটি যখন ইংরেজিতেও daughter রূপে বিদ্যমান্ দেখিতেছি, তখন উহা প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষাতেও ছিল; নিশ্চয় সেকালে কন্যার উপর গো-দোহনের ভার অর্পিত ছিল; যিনি সেকালে গাভী দোহন করিতেন, তিনিই দুহিতা। বলা বাহুল্য, উভয় স্থলেই দুহিতা শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণে কল্পনার খেলা চলিয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। সংস্কৃত ত্রি শব্দ, বাঙ্গলায় যাহা তিন, ইংরেজিতে উহা three, লাটিনে উহা tri; বলা বাহুল্য, উহা প্রাচীন আর্য্যভাষায় বর্ত্তমান ছিল। শাব্দিক পণ্ডিত সেইস লিখিয়াছেন, লাটিন trans, ইংরেজি through, সংস্কৃত তরণ, তরণি, প্রভৃতি শব্দের সহিত উহার সম্পর্ক আছে। সংস্কৃত তৄ ধাতু ঐ সকল শব্দের মূলে বিদ্যমান। সংস্কৃত তৄ ধাতুর অর্থ পার হওয়া, অর্থাৎ উ ত্তী র্ণ হওয়া। পণ্ডিত-মহাশয় বলেন, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যেরা এক ও দুই, ইহার উপরে গণিতে পারিতেন না; তাঁহাদের গণনার শক্তি ঐ সীমায় আবদ্ধ ছিল;

ঐ সীমা যে দিন উত্তীর্ণ হইলেন ও তিন গণিতে পারিলেন, সেইদিন বলিলেন "এই পার হইলাম", অর্থাৎ দুই সংখ্যা পার হইয়া তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায় আসিলাম। এইরূপে তৃ ধাতু হইতে ত্রি অর্থাৎ তিন শব্দের সৃষ্টি হইল। তিনের পর চারি; সংস্কৃত চ ত্বা রি = চ + ত্রি; চ শব্দের সংস্কৃতে অর্থ "আরও" অর্থাৎ আর একটা; চত্বারি অর্থে তিনের উপর আর একটা।

এই সকল দৃষ্টান্তে পণ্ডিতদের কল্পনা কষ্টকল্পনা হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত হইবে। ফলে ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনা ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে কল্পনার সাহায্য লইয়া অনেক শব্দের তাৎপর্য্য জোরপূর্ব্বক আনা হয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। তবে এই কল্পনার খেলার মধ্যেও কিছু না কিছু সত্যের ভিত্তি থাকিতে পারে, এই ভরসায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপনে সাহসী হইয়াছি। বহুস্থলে আমার অজ্ঞতা ও অনবধানহেতু সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সী প্রভৃতি মূল হইতে উৎপন্ন শব্দকে ধ্বনিমূলক দেশজ শব্দ বলিয়া হয়ত গ্রহণ করিয়াছি; এরূপ ভ্রমপ্রমাদ এই প্রবন্ধমধ্যে বহুসংখ্যায় আবিষ্কৃত হইলেও বিস্মিত হইব না।

পরিশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের বানানে এখনও কোন বাঁধা নিয়ম নাই। মনস্বী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার শব্দকোষে সম্প্রতি নিয়ম বাঁধার চেষ্টা করিয়াছেন; এই বোধ করি প্রথম চেষ্টা। আমি এই প্রবন্ধে বানানের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি নাই। অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন; আমি উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী; আমার বানানে, বিশেষতঃ র' ও ড়' এই দুই বর্ণের প্রয়োগে, উত্তর রাঢ়ের বিশিষ্ট উচ্চারণ—রেঢ়ো—উচ্চারণ, হয়ত বহুস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। পাঠক মহাশয় দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

কারক-প্রকরণ

বাঙ্গলা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে। সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা অযুক্ত ও অসঙ্গত। বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংস্কার আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার অষ্টম ভাগের প্রথম সংখ্যায় দেখাইয়াছিলেন যে ইংরেজি case ও সংস্কৃত কারকের তাৎপর্য্য সমান নহে। ইংরেজি ব্যাকরণের case অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় নাই, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের হিসাবে কারক-লক্ষণযুক্ত হইতে পারে না। যেমন, "ভীমো গদাঘাতেন দুর্য্যোধনস্য উরু বভঞ্জ"—এস্থলে ভাঙ্গা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভীম, কর্ম্ম উরু, আর করণ গদাঘাত; তিনেরই সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে। দুর্য্যোধনের উরুর সহিত সেই ভাঙ্গা ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত সে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই; দুর্য্যোধনের সহিত সম্পর্ক তাঁহার উরুর। কাজেই দুর্য্যোধন খোঁড়া হইলেন বটে, কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট তিনি কারকত্ব পাইলেন না, তিনি সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের ইংরেজি অনুবাদে ভীমের nominative, উরুর objective, ও দুর্য্যোধনের হইবে possesive case, কেন না উরু দুইটা তাঁহারই সম্পত্তি। আবার ঐ বাক্যটিকে বাচ্যান্তরিত করিয়া কর্ম্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন,

কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্ব যায় না। আর দুর্য্যোধনের উরু দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমান্ত হইয়া পড়িলেও কর্ম্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে কিন্তু অন্যরূপ; Bhim broke his legs, এখানে দুর্য্যোধনের পাদদ্বয়ের দশা objective; কিন্তু his legs were broken by Bhim এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবামাত্র তাঁহার পা দুখানা একেবারে nominativeএর দশায় পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, কিন্তু ইংরেজির case বাক্যমধ্যে স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিটি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি নাই। কর্ত্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কর্ম্মের বিভক্তিচিহ্ন আছে, কেবল সর্ব্বনামে মাত্র; বিশেষ্য পদ কর্ম্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না; উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্ম্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এক possessive case এর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে পদের পূর্ব্বে preposition বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed by this preposition. ইংরেজিতে যাহার objective case, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, কোথাও বা prepositionএর সহিত অন্বিত। এই preposition গুলা অব্যয় পদ; অন্বিত পদের পূর্ব্বে বসে বলিয়া নাম preposition. এখানে objective case বলায় দোষ নাই, কেননা ইংরেজি caseএর সহিত ক্রিয়ার কোন অন্বয় থাকা আবশ্যক নহে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের কারকের সংজ্ঞা সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে; ইংরেজি হইতে লইলে চলিবে না; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই,

বরং ইংরেজির মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি, বাঙ্গলায় অতগুলা বিভক্তি নাই; গোটা দুই চারি আছে। বাঙ্গালা-কারক সেই কয়টা বিভক্তির সাহায্য লয়। অন্যত্র ইংরেজিতে preposition দ্বারা যে কাজ হয়, বাঙ্গালাতে postposition দ্বারা সেই কাজ চলে। বাঙ্গালার বিভক্তিগুলির একটু আলোচনা আবশ্যক।

(১) কর্ত্তায় বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জ ল পড়িতেছে, ফ ল পাকিয়াছে, মে ঘ ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কর্ত্তায় বিভক্তি চিহ্ন এ', যথা—সা পে কাটে, বা ঘে খায়, 'চল শীঘ্র দুই জ নে কন্যা লঞা যাব', 'তাঁহার মহিমা কিছু লো কে না জানিল'। ঐ এ' চিহ্নের বিকৃতি য়'—যথা, দু জ নে যাব, অথবা, দু জ না য় যাব। এ'র পরিবর্ত্তে তে' ও প্রচলিত,—যথা, দু জ না তে যাব।

(২) কর্ম্মকারকে বহুস্থলে বিভক্তিচিহ্ন থাকে না; যথা—ভা ত খাও, গা ছ কাট, আ ম পাড়। স্থলবিশেষে বিভক্তি চিহ্ন কে' যথা—রা ম কে ডাক, য দু কে বল। পদ্যে কে'র স্থলে রে' বা এ রে' প্রয়োগ দেখা যায়—রা মে রে ডাক, 'ব্রা হ্ম ণী রে দ্বিজবর কহিতে লাগিল'। 'পু ত্রে ডাকি বলে', এ স্থলে কর্ম্মে বিভক্তি এ'। সর্ব্বনামে তো মা কে, আ মা কে স্থলে তো মা য়, আ মা য় দেখা যায়। যথা, তো মা য় বল, আ মা য় দেখ। এই য়'কে এ'র বিকার বলা যাইতে পারে।

(৩) করণে বিভক্তি চিহ্ন এ' এবং তে' যথা—কা ণে শোন, চো খে দেখ, দা য়ে কাট, 'উমেশ ছু রি তে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে'। দ্বা রা, দি য়া প্রভৃতিকে বিভক্তি বলিতে আমি প্রস্তুত নহি।

(৪) বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচুর বিতণ্ডা জন্মাইবার হেতু হইয়াছে। সম্প্রদানের কোন স্বতন্ত্র

বিভক্তি চিহ্ন নাই; কর্ম্মের সহিত অভেদ—যথা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও, 'কন্যা হইলে দাসী করি দিব যে তোমায় (=তোমাকে)'।

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি চিহ্ন লইতে চায় না; postposition বা পরবর্ত্তী অব্যয় পদ দ্বারা কাজ চালায়—ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে, বাঘ হইতে ভয় পায়, হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে। এই হইতে postpositionএর মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালায় অব্যয়ের কাজ করে। উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে। ফলে ঘোড়া, বাঘ এবং হিমালয়ের যখন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় নাই, তখন লাঠি তুলিলেও উহাদিগকে অপাদান কারক বলিতে পারিব না।

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন র', এর', কার'; যথা—আমার বাড়ী, তোমার নাক, রামের বহি, আপনকার অনুগ্রহ। পদ্যে আজিও আমাকার, তোমাকার, সবাকার, প্রচলিত আছে।

(৭) অধিকরণের বিভক্তি এ', তে', যথা—ঘরে থাকে আসনে বসে, তিলে তেল আছে, বিছানাতে শোও। এ' রূপান্তরিত হইয়া য়' আকার গ্রহণ করে, যেমন—বিছানায় শোও।

ফলে বাঙ্গালায় বিভক্তিচিহ্ন অতি অল্প; আবার একই বিভক্তি একাধিক কারককে দখল করিয়াছে। নিম্নের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট হইবে; যথা—

অধিকরণে—মাছ জলে থাকে, রাম নৌকাতে আছেন, অথবা, রাম নৌকায় আছেন।

করণে—কাপড়ে ঢাক, লাঠিতে মার, দড়ায় তোল।

কর্ত্তায়—দুজনে যাব, দুজনাতে যাব, দুজনায় যাব।

কর্ম্মে—'জগন্নাথে প্রণমিল অষ্টাঙ্গ লোটিয়া'।

সম্প্রদানে—'জগন্নাথে দিব কন্যা হয়ে হৃষ্টমন'।

দ্বারা, দিয়া', হইতে, থাকিয়া, চেয়ে, চাইতে, প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে পারে না, তাহা অন্য কারণেও বুঝা যায়। আমা দ্বারা একাজ হইবে না, এই বাক্যে আমাদ্বারা স্থলে আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া, যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। বলা বাহুল্য আমার ও আমাকে বিভক্ত্যন্ত পদ ; দ্বারা এবং দিয়া বিভক্তি চিহ্ন হইলে একটা শব্দের উপর দুটা বিভক্তির যোগ হইয়া পড়ে। ইহা অনুচিত। তদ্রূপ অন্য উদাহরণ—রাম চেয়ে শ্যাম ছোট, অথবা রামের চেয়ে শ্যাম ছোট ; লাঠি দিয়া মার, অথবা লাঠিতে করিয়া মার ; হাতে ক'রে লও ; 'কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম', তাঁহার লেগে মন কি কর্‌ছে ; আমার পানে চাও, "চাহিলা দূতী স্বর্ণলঙ্কা পানে" ; তিনি নইলে চলিবে না, অথবা তাঁহাকে নইলে চলিবে না। এই সকল বাক্যে postposition গুলির পূর্ব্ববর্ত্তী পদের উত্তর বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও বা লুপ্ত হইয়াছে। বিভক্তিচিহ্ন কোথায় থাকিবে বা থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হইতে পারে, বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্ব্বত্রই বিভক্তি বসিত; এখন উচ্চারণে শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তিচিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সমস্তই লোপ পাইতে পারে ; এমন কি এমন সময় আসিতে পারে, যখন postposition গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিচিহ্নে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে উহাদিগকে

বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না; উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। গ্রীকে লাটিনে dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী নানা বিভক্তিচিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সেইরূপ সংস্কৃতে যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গলায় তাহা নাই।

বাঙ্গলায় দ্বিবচনের চিহ্ন একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজ সারিতে হয়। কর্ত্তাকারকে বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি রা'—পশু—পশুরা, মানুষ—মানুষেরা। কিন্তু বহুস্থলে গণ, গুলা, সব, সকল, প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দকেও বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা নিতান্ত অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি "অজয়কিনারে সভে বৈষ্ণবের গণে", "জয়দেব ঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ";—অতএব গণ পৃথক্ শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ত্তা কারক ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন নির্দ্দেশের আর একটি কৌশল আছে। যথা বৈষ্ণবদিকে=বৈষ্ণবদিগকে, বৈষ্ণবদের =বৈষ্ণবদিগের। কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবদের= বৈষ্ণবাদির; বৈষ্ণবদিগের=বৈষ্ণবাদিকর। এককালে আদি শব্দ-যোগে বহুবচন নির্দ্দেশ হইত, স্বার্থে ক' যোগ করিয়া উহা আদিক এই রূপ গ্রহণ করিত। বর্ত্তমান রূপ ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতিমাত্র। কেহ বা বলেন দিগ বৈদেশিক দিগর হইতে আসিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায়, আমার দিগের, মানুষের দিগকে, এইরূপ প্রয়োগ ছিল; উহাতে

দিগ চিহ্নটি এককালে স্বতন্ত্র পদ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

এখন মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম দাঁড়াইল।—(১) কর্ত্তায় সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থান বিশেষে বিভক্তিচিহ্ন, এ', য়, তে।

(২) কর্ম্মের বিভক্তিচিহ্ন কোথাও কে', কোথাও বা রে'; কোথাও বা বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। স্থান বিশেষে চিহ্ন এ', য়।

(৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন র', এর।

(৪) অপাদানের বিভক্তিচিহ্ন নাই।

(৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কর্ম্ম হইতে অভিন্ন।

(৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন এ', য়' এবং তে'; কিন্তু ঐ কয়টি চিহ্ন করণ এবং অধিকরণের নিজস্ব নহে, অন্য কারকেও উহাদের প্রয়োগ হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে বাঙ্গলার যখন প্রয়োগরীতি এইরূপ, তখন ব্যাকরণে এতগুলা কারকের কল্পনার দরকার কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার সম্প্রদানকারক ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা আবশ্যক। সংস্কৃতে কারক অর্থগত। যে কর্ত্তা, সে কর্ত্তাই থাকিবে; 'রামো বনং জগাম' এস্থলে প্রথমান্ত রাম কর্ত্তা; 'রামেণ বনং গতম্' এস্থলে তৃতীয়ান্ত রামও কর্ত্তা। সংস্কৃতে বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হয় না। আবার 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্'—অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না—এস্থলে কাষ্ঠ তৃপ্ত্যর্থধাতুর যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও করণ কারক। 'দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে'—দিনে দুইবার খায়—এস্থলে দিবস ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও অধিকরণ। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি দেখিয়া কারকের নিরূপণ হয় না, অর্থ দেখিয়া কারক নিরূপিত হয়। 'দরিদ্রকে ধন দাও'—এই বাক্যে দরিদ্রের বিভক্তি কর্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে

কিরূপে? ক্রিয়ার সাধক যদি বিভক্তি-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্ব্বত্র সম্প্রদানই হইবে।

কাজেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কর্ম্মের বিভক্তিযুক্ত দেখিলেও কর্ম্ম বলা চলিবে না। কেন না, বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে হইলে, 'সাপে কাটে, বাঘে খায়' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্ত্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐরূপ কিছু একটা বলিতে হয়।

এইপক্ষের উত্তরে এইরূপ বলা চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণতঃ কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই কর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক বলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহা হইলে ভোজনক্রিয়ার পাত্রকে সম্ভোজন কারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়ন কারক, এইরূপে ক্রিয়ামাত্রেরই জন্য এক একটা বিশিষ্ট কারক স্থির করিতে হইত। ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম্ম; উহার নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রের পক্ষেই এই বিধি। কেবল দানক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক কল্পনা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্যান্য ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঙ্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার সম্প্রদান না বলিয়া কর্ম্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণেরই দোহাই দিয়া অন্য একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্ব্বত্র স্থির হয়, এমন নহে। একটু জোর করিয়া নানা অর্থে একই কারক ঘটান হয়। যেমন অপাদানের মূল অর্থ, যাহা হইতে বিশ্লেষণ ঘটে বা সরান যায়। যেমন, অশ্বাৎ পতিতঃ, গৃহাৎ প্রস্থিতঃ, জলাৎ উত্থিতঃ, এই সকল উদাহরণে অশ্ব, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু তদ্ব্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান; তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন। এই দুই দৃষ্টান্তে ভৃত্যকে ও শত্রুকে কিছুতেই দানের পাত্র বলা যাইতে পারে না; তবে প্রহার-দানটা যদি দান হয়, তাহা হইলে উহারা সম্প্রদান বটে। অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণ তাহাদের জন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন 'ক্রোধদ্রোহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।' যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সৌভাগ্যশালী জীব; কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধের পাত্র ও দ্রোহের পাত্র ব্যক্তিরাও সম্প্রদান-শ্রেণিতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন আর কোন হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে', 'তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্', ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে সংস্কৃত ব্যাকরণে অর্থ দেখিয়াই কারক স্থির হয়, বিভক্তি দেখিয়া হয় না। কিন্তু এখানে দেখিতেছি উলটা; এখানে বিভক্তির খাতিরেই কারকের সংজ্ঞা স্থির হইয়াছে। ক্রোধের

পাত্র, দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গলা ভাষায় দানের পাত্রকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যরূপ কায়দাও আছে। ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, এই অর্থে 'ধ র্ম্ম মভিনিবিশতে' এই বাক্যে ধ র্ম্ম পদের উপসর্গ সহিত ধাতু যোগে কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপূর্ব্বক ক্রুধ্ ধাতু ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান কর্ম্ম হইয়া যায়; শত্রবে দ্রুহ্যতি, কিন্তু শ ত্রু মভি-দ্রুহ্যতি। ক্রীড়ার্থক দিব্ ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা পায়। যেমন অ ক্ষা ন্ দীব্যতি, অ ক্ষৈ দীব্যতি। কর্ম্মসংজ্ঞা কেন পায়? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তি চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণে দানক্রিয়ার সম্প্রদানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্তু একমাত্র দানক্রিয়ার জন্য বাঙ্গলায় একটা পৃথক্ কারক খাড়া করা উচিত কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

সম্প্রদানকে যদি বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া দিতে হয়, অপাদানকে তুলিতেই হইবে। অপাদানের জন্য কোন বিভক্তি চিহ্নই নাই। হ ই তে, থে কে, প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায় মাত্র। আমি দ্বা রা, দি য়া প্রভৃতি পদকে করণকারকের বিভক্তি চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি; হ ই তে, থে কে, প্রভৃতিকেও অপাদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব না। উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ; দ্বা রা পদটি সংস্কৃত হইতে অবিকল আসিয়াছে; অন্যগুলা হয় ত অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective case এর

পূর্ব্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপ বাঙ্গলা *পদের পরে বসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পদকে শাসন করে বা পদের সহিত অন্বিত* হয়। হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন এস্থলে গঙ্গা কর্ত্তাকারক, কেননা ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় নাই; হিমালয় পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাবে in the objective case governed by the *postpostion* হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে যে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকিবে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রযোজ্য হইতে পারে না। হিমালয় হইতে, এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে 'রাম সীতা সহিত বনে গিয়াছিলেন', এই বাক্যে সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাঙ্গলায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই। এই দুইটিকে উঠাইতেই হইবে। থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। আকারান্ত শব্দের পর 'এ' বিকৃত হইয়া 'য়' হয় মাত্র; যথা নৌকায়, বিছানায়। প্রাচীন পুঁথিতে নৌকাএ, বিছানাএ, এইরূপ বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয় স্থলেই বিভক্তি এক; তবে অর্থ দেখিয়া কোন্‌টা করণ, আর কোন্‌টা অধিকরণ, বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। 'হাতে গড়া' এস্থলে হাত করণ, আর 'হাতে রাখা' এস্থলে হাত অধিকরণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ কি অধিকরণ, নির্ণয় করা

দুঃসাধ্য হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ 'অলং বিবাদেন,' 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন', 'মাসেন ব্যাকরণমধীতম্', জটাভি স্তাপসমদ্রাক্ষম্' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ান্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই, উহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্য বিশেষ বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলায় এইরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে। বিবাদে কাজ নাই, মূর্খ পুত্রে দরকার নাই, এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি, জটায় তাপস চিনিয়াছি, এই সকল বাঙ্গলা বাক্যে বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলা চলিতে পারে, কেন না ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্ কারক বলিব? বোধ হয় না যে সকল পণ্ডিতে একই উত্তর দিবেন।*

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গলা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। সীতাসঙ্গে বন গেলেন, আনন্দে ভোজন করে, অন্তরে দুঃখিত হইয়া, "সচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন," "কি কারণে জীয়াইলে না গেলে যমঘর," "তুঞি পুত্রে লজ্জা আমি লভিলাম," "ক্রোধে দুইগুণ বীর্য্য বাড়িল শরীর," "আপনার বলে বীর করিল টঙ্কার", "বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে", "উচ্চস্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া," "চারি হস্তে ভোজন করিলা ব্রজমণি," এই সকল স্থলে এ' এবং তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব? উহারা স্পষ্টতঃ করণের লক্ষণেও আসে না। কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গলায় তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা

লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু এত ক্লেশের প্রয়োজন কি ?

ফলে বাঙ্গলায় ঐ রূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই ; কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বাঙ্গলায় চলিবে না। এই মাত্র বলিলাম, 'ক্লেশের প্রয়োজন কি ?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে বাঙ্গালায় সম্বন্ধসূচক বিভক্তি র' বসিয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি ?' বলিলেও বাঙ্গলায় কোন দোষ ঘটিত না। এখানে এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি ? উত্তর দেওয়া কঠিন। কাজেই বাঙ্গলায় ঐরূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান ; সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণির মধ্যে ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ, সেই সকল স্থলেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্তরূপ বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্মবিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজি হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক predicate এর একটা subject আছে, একটা object থাকিতেও পারে এবং তদ্ভিন্ন বিবিধ adjunct থাকিতে পারে। ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক এই adjunct গুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে এ' বা তে' বিভক্তি গ্রহণ করে ; তা করণই হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অর্থযুক্তই হউক। কর্ম্ম ও

কর্ত্তা ব্যতীত আর যে সকল বিশেষ্য পদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। পণ্ডিতেরা আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে নামের জন্য আটকাইবে না।

যে সকল পদ এ' আর তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে ক্রিয়াটিকেই অবলম্বন করিয়া থাকে; ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল', 'বিছানায় শোও', 'হাতে লও', 'কানে শোন,' 'ছুরিতে কাট', 'দড়িতে বাঁধ', 'সুখে ঘুমাও', 'আনন্দে নাচ', 'সঙ্গে চল', 'হাতীতে যাবেন', এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বিভক্ত্যন্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ আনিবার প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে, কেন না ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে অন্বয় আছে; মাঝে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। এই সমুদয় পদকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবখানাই ঐরূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে', 'বাঘে খায়', 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে', এই সকল বাক্যের কর্ত্তাগুলি যেন instrumentএ বা করণ কারকে পরিণত হইয়াছে; উহারা যেন কর্ত্তাও বটে, করণও বটে। সাপে কাটিয়াছে, এই বাক্যে কাটা ক্রিয়ার করণ যেন সাপ; বাঘে খায়, এই বাক্যে খাওয়া ক্রিয়ার instrument যেন বাঘ; যেন কোন দৈবশক্তি সাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা, ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছে; সাপ বাঘের বা রাম রাবণের যেন সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই।

এই জন্য সন্দেহ হয় সাপ, বাঘ, রাম, রাবণ, যেন প্রকৃত কর্ত্তা নহে; হয় ত কর্ম্মবাচ্যের সর্পেণ, ব্যাঘ্রেণ, রামেণ, রাবণেন প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে, এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐরূপ 'মোহে বল', 'তোমায় দিব', 'আমায় ডাক', "কর্ণ পুত্রে ডাকি বলে", "তব পুত্রে কন্যা দিব", "জীবে দয়া কর", এই সকল স্থলে কর্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মানুষগুলা যেন তত্তৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। এ' আর তে' এই দুই বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক্, তথাপি কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি, যে বাঙ্গলা ব্যাকরণের কারকপ্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক :—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তিচিহ্ন এ' এবং তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিয়া দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গলা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই।

সম্বন্ধসূচক বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অন্বয় আছে, সেইগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান নিকট নহে। 'দুর্য্যোধনস্য ঊরু' 'রামস্য গৃহম্', 'নদ্যা জলম্', 'বায়োর্ব্বেগঃ', এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব নিকট; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শয়নম্', 'অশ্বস্য গতিঃ', 'তব পিপাসা', 'সুখস্য

ভোগঃ', 'ধনস্য দানম্', এ সকল স্থলে তত্তৎ কর্ত্তৃপদের বা কর্ম্মপদের সহিত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃৎপ্রত্যয় যোগে এস্থলে বিশেষ্যে পরিণত হইয়াছে; ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্তি পাইয়াছে। কিন্তু এরূপ কৃদন্ত পদ যোগেও সর্ব্বত্র ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় না। 'ধনস্য দাতা', 'ধনং দাতা', দুই সিদ্ধ, যদিও উভয়ের মধ্যে অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'গৃহং গচ্ছন্', 'জলং পিবন্', গৃহং গন্তুম্', এই সকল স্থলে কৃদন্তের পূর্ব্বে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

অন্যরূপ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী, হিতসুখ-নমোভিশ্চতুর্থী, কালাধ্বনোরবধেঃ পঞ্চমী, হেতৌ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া, ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত, কুণ্ডলায় হিরণ্যম্, গুরবে নমঃ, মাঘাৎ তৃতীয়ে মাসি, ধনাৎ কুলম্, ভয়াৎ কম্পঃ, আকৃত্যা সুন্দরঃ।

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে সংস্কৃত ব্যাকরণে নানা বিশেষ বিধি আছে। সীতয়া সহ, ত্বয়া বিনা, দীনং প্রতি, কৃপণং ধিক্, কলহেন কিম্, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ সকল স্থলে বিভক্তিযুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অব্যয় পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে, অতএব উহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে কারক-লক্ষণযুক্ত নহে।

রামের বাড়ী, মহিষের শিঙ, ঘোড়ার ডিম, প্রভুর ইচ্ছা, অন্নের পাক, জলের শোষণ, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। ঘরে গিয়া, জলে নামিয়া, পথে চলিতে চলিতে, এই সকল দৃষ্টান্তরও বাহুল্য অনাবশ্যক।

অন্য শ্রেণির দৃষ্টান্ত কতকগুলি দেওয়া যাক :—

দীনের প্রতি, সীতার সহিত, ঘরের বাহিরে, নদীর

কাছে, গ্রামের নিকটে, ঘরের চারিদিকে, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তিচিহ্ন র'। কৃপণকে ধিক্, গুরুকে প্রণাম, তোমাকে নাহিলে, আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি কে'। 'ঘোড়ার [জন্য] ঘাস' 'রান্নার [জন্য] হাঁড়ি' 'রোগের [জন্য] ঔষধ', এ সকল স্থানে জন্য শব্দটির ব্যবধান ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি চিহ্ন র'।

'চোখে কাণা', 'পায়ে খোঁড়া', 'আকারে ছোট', 'বয়সে বড়', 'নামে দশরথ', 'জাতিতে কায়স্থ', 'ব্যাকরণে পণ্ডিত', 'ক্রোধে তাপ', ইত্যাদি স্থলে সেই পূর্ব্বপরিচিত এ' বা তে'।

'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে', 'জল থেকে উঠেছে', 'ছাদ থেকে দেখ্‌ছে', 'মাঘ হইতে তৃতীয় মাস', 'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট', 'ঘর হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূর্ব্বে বিভক্তি প্রায় লুপ্ত থাকে। ক্বচিৎ বিভক্তির যোগ হয়। যথা জলে থেকে, রামের চেয়ে, আমাকে হইতে, আমার হইতে, ছুরিতে করিয়া, তোমাকে দিয়া।

দেখা গেল, বাঙ্গালায় বিভক্তির সংখ্যা অতি অল্প। এই বিভক্তিগুলির উৎপত্তি কিরূপে হইল, উহারা কবে কিরূপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল, তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। বিদেশী পণ্ডিতেরা ইহা আলোচনা করিয়াছেন; দেশী পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। অতি প্রাচীন বাঙ্গলায় ঐ সকল বিভক্তির রূপ কেমন ছিল, তাহার রীতিমত অনুসন্ধান না হইলে মীমাংসা হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিব। কর্ম্ম কারকে চলিত বিভক্তি কে' যথা—আমা-কে তোমা-কে, তাহা-কে রাম-কে হরি-কে ইত্যাদি। সম্বন্ধে বিভক্তি র' বহুস্থলে আগে একটা ক' লইয়া 'কার' হইয়া যায় যথা—আমা-কার,

তোমা-কার, আপনা-কার, সবা-কার, তথা-কার, সেখান-কার, আজি-কার, কালি-কার। বাঙ্গলায় সম্বন্ধ সূচনায় এই ক'য়ের প্রচলন অধিক না থাকিলেও হিন্দী ভাষায় ইহার প্রচলন খুব অধিক; যথা,—সাহিত্য-কার ভাণ্ডার, খেদ-কী বাত, জিস্-কে ভাষা, প্রচার করণে-কার, ইত্যাদি। অধিকরণ কারকে প্রধান বিভক্তি এ', বা তে'; কিন্তু স্থলবিশেষে অধিকরণেও কে' বসে, যথা—আজি-কে, কালি-কে। এই সকল দৃষ্টান্তে ক' আসিল কোথা হইতে? সংস্কৃতে সাত দফা বিভক্তি আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোথাও ক' নাই। কাজেই গোলে পড়িতে হয়। কেহ বলেন, সংস্কৃতে না থাক্, প্রাকৃতে 'কের' বিভক্তি পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই কের সংস্কৃত কৃত বা কৃতে হইতে উৎপন্ন। এই প্রাকৃত কের ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঙ্গলা ভাষায় কে', ক' কার' প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য পণ্ডিতে বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে ক' হইতে বাঙ্গলায় এই কে', কার' প্রভৃতি উৎপন্ন। অতএব এই স্বার্থে ক' যে কোন শব্দের উপর বসিতে পারে, তাহাতে অর্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে না।

দলীল দস্তাবেজের ভাষায় এই স্বার্থে ক'য়ের একটা কৌতুককর দৃষ্টান্ত প্রচলিত আছে। চলিত প্রথামতে কোন একটা দলীল লিখিতে হইলে কস্য দিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং আগে দিয়া শেষ করিতে হয়। যথা—কস্য তমস্সুকপত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে। এই 'কস্য' এবং 'আগে' কোথা হইতে আসিল?

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে কি না, জানি না। আমার বোধ হয় এই আগে সংস্কৃত আজ্ঞাপয়তি হইতে প্রাকৃতের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। অতি পুরাতন তাম্রশাসনাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দানকর্ত্তা রাজা তাঁহার দানপত্রের আরম্ভেই তাঁহার অমাত্য

কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রজাবর্গ প্রভৃতিকে "আজ্ঞাপয়তি সমাদিশতি চ" বলিয়া হুকুম জারি করিতেছেন। সেই প্রথার অনুসরণে অদ্যাপি বাঙ্গালার জমিদারেরা জমিদারি মধ্যে কোন আদেশ জারি করিতে হইলে আদেশপত্র মধ্যে আরম্ভ করেন—"মণ্ডল-গোমস্তা-হালসানা-প্রজাবর্গাণাং প্রতি আগে।" এই আগে সেকালের আজ্ঞাপয়তি পদেরই অপভ্রংশ। ইহা যে আদেশজ্ঞাপন বাক্য, তাহা ভুলিয়া গিয়া এখন পাট্টা কবুলতি তমসুক প্রভৃতি যে কোন দলীলে দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষই লিখিয়া বসেন "কার্য্যঞ্চ আগে"—অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে আজ্ঞা (আদেশ) দিতেছি। আগে সম্বন্ধে এই কথা। তার পরে কস্য। কস্য তমসুক-পত্রমিদং—কাহার তমসুক পত্র এখানা?—এইরূপ অর্থ ঘটাইলে বিপরীত কাণ্ড হইবে। কিন্তু এই বাক্যের অন্তর্গত ক' কিম্ শব্দের ক' না হইয়া যদি স্বার্থে ক' হয়, তাহা হইলে একটা মীমাংসা পাওয়া যায়। যথা দাসস্য=দাসকস্য, ঘোষস্য=ঘোষকস্য, চট্টোপাধ্যায়স্য=চট্টোপাধ্যায়কস্য। দলীলের আরম্ভ —"লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দাসকস্য তমসুকপত্রমিদম্" "লিখিতং শ্রীঘনরাম দত্তকস্য পট্টকপত্রমিদম্" "লিখিতং শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়কস্য কবুলতি পত্র মিদম্"—"লিখিতং শ্রীদুর্গাচরণ-ভূতিকস্য একরারপত্রমিদম্"—ইত্যাদি বিবরণের ফারম (form) ছকিতে গেলে এইরূপে ছকিতে হইবে;— "লিখিতং শ্রী——————————কস্য———পত্রমিদম্"—শ্রী'র পরবর্ত্তী ফাঁকে দাতার বা গ্রহীতার নামটা বসাইয়া দিলেই চলিবে। এই রূপে দাসকস্য, দত্তকস্য, ভূতিকস্য, প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের নামের সাধারণ অংশ 'কস্য' টুকু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া একালের দলীলে পত্রে বিরাজ করিতেছে।

কে, কার, প্রভৃতি বাঙ্গলা বিভক্তির মূল যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙ্গলায় উহাদের আরও সংক্ষিপ্ত আকার দেখা যায়। যথা আমা-ক,

তোমা-ক, মো-ক, তো-ক, সবা-ক, আপনা-ক; আমা-কর, মো-কর, সবা-কর; ইত্যাদি।

অধিকরণের বিভক্তিচিহ্ন তে',—ইহারও মূল যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙ্গালায় উহা সংক্ষিপ্ত আকারে ত-রূপে বর্ত্তমান, তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে—যথা—আমা-ত, তোমা-ত, জলে-ত, নৌকা-ত। যত্র, তত্র, কুত্র, প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ত্র' টুকুই কি শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ত'য়ে দাঁড়াইয়াছে ?

বাঙ্গালা এ' বিভক্তি আর য়' বিভক্তি যে একই, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজি কালি আমরা যেখানে লিখি আমা-য়, তোমা-য়, প্রাচীনেরা সেখানে লিখিতেন আমা-এ, তোমা-এ।

বাঙ্গালা বিভক্তিচিহ্নগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া শেষ পর্য্যন্ত ক, ত, র, এ (=য়) আ এবং দি এই ছয়টির অধিক অবশিষ্ট থাকে না। দেখা যাউক :—

আমা-এ = আমা-য় = আমায়
তোমা-এ = তোমা-য় = তোমায়
তাঁহা-এ = তাঁহা-য় = তাঁহায়
লোক-এ = লোকে
বাঘ-এ = বাঘে
জল-এ = জলে
নৌকা-এ = নৌকা-য় = নৌকায়
বিছানা-এ = বিছানা-য় = বিছানায়

আমা-ক = আমা-ক-এ = আমাকে
মো-ক = মো-ক-এ = মোকে
তাঁহা-ক = তাঁহা-ক-এ = তাঁহাকে, তাঁকে

আমা-র	=	আমার
তোমা-র,	=	তোমার
তাঁহা-র	=	তাঁহার
হরি-র	=	হরির
লোক-এ-র	=	লোকের
শ্যাম-এ-র	=	শ্যামের

আমা-র-এ	=	আমা-রে	=	আমারে	(আমাকে)
তাঁহা-র-এ	=	তাঁহা-রে	=	তাঁহারে	(তাঁহাকে)
হরি-র-এ	=	হরি-রে	=	হরিরে	(হরিকে)
রাম-এ-র-এ	=	রাম-এরে	=	রামেরে	(রামকে)

সবা-ক-র	=	সবা-কার	=	সবাকার
আপনা-ক-র	=	আপন-কার	=	আপনকার
আজি-ক-র	=	আজি-কার	=	আজিকার
কালি-ক-র	=	কালি-কার	=	কালিকার
আজি-ক-এ	=	আজি-কে	=	আজিকে
কালি-ক-এ	=	কালি-কে	=	কালিকে

আমা-ত	=	আমা-ত-এ	=	আমা-তে	=	আমাতে
তোমা-ত	=	তোমা-ত-এ	=	তোমা-তে	=	তোমাতে
তাঁহা-ত	=	তাঁহা-ত-এ	=	তাঁহা-তে	=	তাঁহাতে
নৌকা-ত	=	নৌকা-ত-এ	=	নৌকা-তে	=	নৌকাতে
বাড়ী-ত	=	বাড়ী-ত-এ	=	বাড়ী-তে	=	বাড়ীতে
ছুরি-ত	=	ছুরি-ত-এ	=	ছুরি-তে	=	ছুরিতে
জল-ত	=	জল-এ-ত-এ	=	জল-এতে	=	জলেতে

বহুবচনের চিহ্ন কর্ত্তায়—রা, এরা; কর্ম্মে—দিকে, দিগকে সম্বন্ধে—দের, দিগের। ইহাদের উৎপত্তির এখনও মীমাংসা হয় নাই। ফারসী দিগর শব্দ হইতে দিগ আনা নিতান্ত কষ্টকল্পনা। তার চেয়ে সংস্কৃত আদি হইতে দি' আনা সঙ্গত; উহার উপর স্বার্থে ক যোগ করিলেই দিক=দিগ আসিবে।

বহুবচনের চিহ্নগুলি এইরূপে ভাঙ্গিয়া দেখা যাইতে পারে :—

আমা-র-আ	= আমা-রা	= আমরা
তোমা-র-আ	= তোমা-রা	= তোমরা
তাঁহা-র-আ	= তাঁহা-রা	= তাঁহারা
মুনি-র-আ	= মুনি-রা	= মুনিরা
বাঙ্গালী-র-আ	= বাঙ্গালী-রা	= বাঙ্গালীরা
ইংরেজ-এ-র-আ	= ইংরেজ-এরা	= ইংরেজেরা
লোক-এ-র-আ	= লোক-এরা	= লোকেরা
আমা-আদি-ক-এ	= আমা-দিকে	= আমাদিকে
আমা-আদিক-ক-এ	= আমা-দিগ-কে	= আমাদিগকে
লোক-আদিক-ক-এ	= লোক-দিগ-কে	= লোকদিগকে
আমা-আদি-এ-র	= আমা-দের	= আমাদের
আমা-আদিক-এ-র	= আমা-দিগের	= আমাদিগের
লোক-আদি-এ-র	= লোক-দের	= লোকদের
লোক-আদিক-এ-র	= লোক-দিগের	= লোকদিগের
আমা-র আদি-এ-র	= আমার-দের	= আমাদের
লোক-এ-র আদি-এ-র	= লোকের-দের	= লোকেরদের
	= লোকেদের	= লোকদের

বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালার বিভক্তিচিহ্ন কেবল তিনটি—এক বচনে চিহ্ন এ' (= য়'), সম্বন্ধে চিহ্ন—র', এবং কর্ত্তায় বহুবচনের

চিহ্ন আ'। এই কয়টি বিভক্তিচিহ্ন দরকারমত ক', ত', এবং দি'—এই কয়টি চিহ্নে যুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় সমুদয় বিভক্ত্যন্ত পদ নিষ্পন্ন করে।

পরিশিষ্ট

[সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমার অনুরোধক্রমে বাঙ্গালা বিভক্তিচিহ্নের বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বসন্ত বাবুর নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বসন্ত বাবু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি গভীর আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার মতামত পাঠকগণের উপাদেয় হইবে বুঝিয়া তাঁহার মন্তব্যটুকু আমি তাঁহার অনুমতিক্রমে অবিকল প্রকাশ করিলাম।—আশ্বিন, ১৩২৩]

প্রথমা—প্রথমার একবচনে এ' বা ই' প্রত্যয় এবং প্রত্যয় লোপ মাগধীর অনুরূপ [১]। উদাহরণ,—

পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব।

—কৃষ্ণকীর্ত্তন

শুনিয়া রাজা এ বোলে হইয়া কৌতুক।

—সঞ্জয়ের মহাভারত

কোন মতে বিধাতা এ করিছে নির্ম্মাণ।

—রামেশ্বরী মহাভারত

কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাএ।

— কৃষ্ণকীর্ত্তন

ভ্রূহি কাম ধনু নয়ন বাণে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

[হি=ই]

(১) 'অত ইদেতৌ লুক্ চ'—প্রাকৃত প্রকাশ, ১১।১০

সু' প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাকৃতে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়; [১] যথা—মুনী, পতী, বাউ, গুরূ প্রভৃতি। বাঙ্গলা সাহিত্যেও এইরূপ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসু তার পতী।

—কৃষ্ণকীর্ত্তন

হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

মাগধীর অনুরূপ 'হনুমন্তা,' 'নাতিআ' ইত্যাকার পদও দৃষ্ট হয়; যথা—

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা ॥ —কৃষ্ণকীর্ত্তন
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞিঁ ॥—ঐ

প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই [২]। সম্ভবতঃ সেই হেতু বাঙ্গলাতেও নাই। বহুবচনে নির্দ্দিষ্ট বিভক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। গণ, সব, সকল, যত প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হইত। শূন্যপুরাণ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতির পুথিতে মুরা, আমরা, তোমরা, তারা, ইত্যাদি পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়; কিন্তু পুথির অপ্রাচীনত্ব হেতু ওগুলিকে প্রাচীন বলা চলে না। পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত প্রাচীনতম গ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তনের তিনটি মাত্র স্থলে রা' দিয়া বহুবচনের পদ পাওয়া গিয়াছে; যথা—

আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী ॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।

(১) 'সুভিস্সুপ্সু দীর্ঘঃ'—প্রাকৃত প্রকাশ, ৫। ১৮

(২) 'দ্বিবচনস্ত বহুবচনম্'—প্রা॰প্র॰, ৬।৬৩; 'দ্বিত্বং বহুত্বং'—প্রা॰ লক্ষণ, ২।১২।

পুছিল তোহ্মারা কেহে তরাসিল মণে ॥
আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁণে।

রাজেন্দ্রদাসের আদি পর্ব্বে,—

তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাতে কহিল।
আহ্মারা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল ॥

ষষ্ঠ্যন্ত আহ্মার, তোহ্মার পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার-যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আহ্মারা ও তোহ্মারা পদ হইয়া থাকিবে [১]। স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'আমার প্রসাদে তোমরা হবে উত্তম গতি'; এখানে তোমরা অর্থে তোমাদের।

দ্বিতীয়া—দ্বিতীয়া বিভক্তিতে এ' প্রত্যয় প্রথমার অনুকরণ। উদাহরণ,—

দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।—ঐ
নয় বান দিয়া দৈত্য বিন্ধিল রাজা এ।
বক্রুবাহ এক সত বান মারে তাএ ॥
—হরিদাস কৃত জৈমিনি ভারতের পুথি

(I) 'In Bengali the nominative plural may, in the case of human beings, be formed by adding ā to the genitive singular; thus *santān*, a son; genitive singular, *santānēr*; nominative plural, *santānērā*.. The same is the case with the pronouns; thus *āmār*, of me; *āmarā*, we; *tāhār*, his; *tāhārā*, they.'

Encyclopœdia Britannica (11th ed.), Vol. 3, p. 734.

'সম্বন্ধের র হইতে কর্ত্তাকারকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে।'—যোগেশবাবুর ব্যাকরণ, পৃ০২০৮।

নিমিত্তার্থে বা তাঁদর্থ্যে প্রযুক্ত প্রাকৃত কএ' বিভক্তি[১] বাঙ্গলায় কে' বা ক' বিভক্তিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান অযুক্ত নহে।

কে,' ক' প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

রৌদ্রে কাঁটাকুটায় রাঁধে।
খড় কাট ব র্ষা কে রাখে॥—ডাক
ক ং স কে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
কাহ্ন মো কে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।—ঐ
প্রথমত কংশে পূ ত না ক নিয়োজিল।—ঐ
মানুষ নিয়োজিল মা রি বা ক তাএ।—ঐ
দেবতা দেহারা ন ছিল পূ জি বা ক দেহ।—শূন্যপুরাণ
গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তা ক॥

—বিশারদ কৃত বিরাটপর্ব্ব

রে' বা এরে'র মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান।

পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তো হ্মা রে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

(১) 'ণং ভণাহি ইমশ্‌শ কএ মচ্ছিআভত্তুণো ত্তি' —শকুন্তলা, প্রবেশক ; 'ইমস্‌স কএ সউন্তলা কিলম্মই'—শ০কু০, ৬ অঙ্ক ; 'পুপ্‌ফঞ্জলি-দাণ-কএ নীবাবচএ কিম্ আলস্‌সং'—কু০ চ০, ৫।৩০ ; 'তুমম্মি ভণাম জূহি-কএ'—কু০চ০, ৫।৩৪ ; 'অখুড়িঅ-গমণম্, অতোড়িঅ-মদম্, অতুড়িঅ-লক্‌খণং মহেভ-কুলং। অণিলুক্ককন্ত-সিণেহো গউড়ো পেসীঅ তুজ্‌ঝ কএ॥'—কু০চ০, ৬।৭৮ ;

'পরিহর মাণিণি মাণং
পেক্‌খহি কুসুমাইঁ নীবস্‌স।
তুম্হ কএ খর হিঅও
গেহ্নই গুড়িআ ধণুংহি কিল কামো॥

—প্রা০পৈ০, ১।৬৭

কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন ব ধি বা রে ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

দৈবকীর প্রসব ক ং শে রে জাণায়িল ॥—ঐ

তৃতীয়া—এঁ' বা এ' প্রত্যয় অপভ্রংশের অনুরূপ [১]। উদাহরণ,—

মিছাই মা থা এ পাড়এ সান ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

দধি দু ধেঁ পসার সজাআঁ।—ঐ

ত'(=ত স) প্রত্যয় যোগে—

মিনতী করিআঁ হা থে ত ধরিআঁ

আন গিআঁ চন্দ্রাবলী ॥—ঐ

চতুর্থী—চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয়।

পঞ্চমী—হ তেঁ, হৈ তেঁ, হ স্তে, হ নে প্রভৃতি প্রাকৃত হিং তো রই রূপভেদ [২]। অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে তে' ও ত' প্রয়োগ দেখা যায়।

এবে হ তেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

কথাঁ হৈ তেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।—ঐ

হাড় হ স্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়।

—আলাওল কৃত পদ্মাবতী

সেই হ নে প্রাণ মোর আছে বা না জানি।

—সঞ্জয়ের মহাভারত

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।

তুই হ স্তা কৈকয়ীত করিল ভকতি ॥

—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ড

(১) 'ত্রিষেং টঃ'—প্রা০ সর্ব্বস্ব; 'এংটা'—স০ সা০, প্রা০ অ০, সূ০ ২৪।

(২) 'হিংতোভ্যসঃ—প্রা০ লক্ষণ। আর্ষ প্রাকৃত ও মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয়; যথা—'দেবাহিংতো' (দেবাৎ), 'তুমাহিংতো' (ত্বৎ)।

রা জা তে বিদায় মাগে ভরত কুমার।

—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের পুথি

এতেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তো তে নিবারিলোঁ মন।

আ ম্মা তে চাহসি বাঁশী।—ঐ

আ ম্মা ত আধিক কোন দেহ আছে।—ঐ

মাঅ বা প ত বড় গুরুজন নাহিঁ।—ঐ

ষষ্ঠী—কে র, ক র, এ র প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কে র ক শব্দের বিকারে উৎপন্ন। উদাহরণ—

জদি নয়ন কমলবর মু কু ল কে র কন্তি ধর

খর নখর ঘাত কই সেহে বেলা।—বিদ্যাপতি

সদা বসথি জমুনাক তীর।

পর জু ব তী কে র হরথি চীর॥—ঐ

তিরীর যৌবন রাতির সপন

যেহ্ন ন দী কে র বাণে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

দেখিয়া রাম দামোদর ব ৎ স কে র সঙ্গে।

—গুণরাজ খান কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়

রূ পা ক র পাটএ রেসাতির বৈসএ হাট।

—শূন্যপুরাণ

এখন হইনু কো ড়া ক র ভিখারি।

— মাণিক চন্দ্র রাজার গান

ক' প্রত্যয়—

বিঘিনি বিথারিত বাট।

প্রে ম ক আয়ুধে কাট॥—বিদ্যাপতি

অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।

নিত্যানন্দ রাম বন্দো রোহিণীক সুত ॥

—লোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল

বিহারক রাজপুরী নামে অম্রাবতী।
বীরনারায়ণ দেব যার অধিপতি ॥

—মহারাজ বীরনারায়ণ কৃত কিরাত পর্ব্ব

গৃহস্থক ধর্ম্ম এহি পুরাণ কহিছে।

—সঞ্জয় কৃত মহাভারত

লজ্জার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে ত' বা তে' প্রয়োগ। যথা—

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।

—কৃষ্ণকীর্ত্তন

দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।—ঐ
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।—ঐ
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।—ঐ
সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া।

র' প্রত্যয়—(১) অপভ্রংশ ভাষার অনুকরণে [১]।
(২) প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' র রকারে পরিণতিতে [২]।

সপ্তমী—ত', তে', তা', যোগে; ইঁহাদের মূল খ' বা ত্থ'।
উদাহরণ,—

খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
সেজাত সুতিআঁ একসবী নিন্দ না আইসে।—ঐ
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।—ঐ

এ' প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুবর্ত্তিতায়।

---

(১) অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ'— সিদ্ধহেম০, ৮।৪।৪৩৪

(২) জাণ—জাঁর—যাঁর বা যাঁহার; তাণ—তাঁর বা তাঁহার ইত্যাদি।

বিভক্তি চিহ্নের নির্ব্বিশেষ প্রয়োগ—

প্রথমায় ত', তে' প্রত্যয়,

আমা সভা কৌতুকে আসি ব্র হ্মা ত হরিল।

—কবিশেখর কৃত গোপাল বিজয়ের পুথি

মুঞি যত কৈলুম পাপ বিশ্বমিত্র হেন বাপ

মে ন কা ত ধরিছিল উদরে।

—রাজেন্দ্র দাসের আদি পর্ব্ব

মূ র্খে তে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ

হাঁটু পাড়ি ঈ শা নে তে আরম্ভে নিড়ান॥

—রামেশ্বরের শিবায়ন

দ্বিতীয়াতে ত', তে',—

কত বড় বাস তুমি সি তা ত রূপসি।

—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুথি

পণ্ডিত না হম মুই কহিলুম তো মা ত।

—রামজীবন কৃত সূর্য্যের পাঁচালী

কহিল তো হ্মা তে আহ্মি ব্রত ফল বিধি।

—মৃগলুব্ধ

কি য়াশ্চর্য্য কথা তুমি খাইবে আ মা তে॥

—গোশৃঙ্গের যুদ্ধপালা পুথি

পঞ্চমীতে এ'

তার পরাণ হরিলোঁ শ রী রে॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

পঞ্চমীতে ক'

এ তীন ভুবনে নাহিঁ আ হ্মা ক বীর॥—ঐ

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব। একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ।

না

আর্য্য ভাষায় না' অতি প্রাচীন শব্দ; উহা হাঁ' এর বিপরীত। সম্মুখের দিকে উর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয়, হাঁ,—উহা সম্মতিসূচক; আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয়, না,—উহা অসম্মতি-জ্ঞাপক। না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ; উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে।

এই না'কে অব্যয় পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কেননা উহা কোনরূপ বিভক্তিচিহ্ন গ্রহণ করিতে চায় না। সাধারণ ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে; কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, সাধারণতঃ তাহাকে একবারে উলটাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ আর নাই।

না' যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে চায়, তাহার পরে বসে। যথা;—তিনি করেন না, করছেন না, করতেন না, করলেন না, করছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ; তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়ার পরে না' বসিতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এবং 'করিয়াছিলেন না' এই উভয় স্থলেই 'করেন নাই' এইরূপ প্রয়োগ হয়। এই ই-যুক্ত না বর্ত্তমান ক্রিয়া করেন-কে অতীতকালে পৌছিয়া দেয়। তিনি করেন—বর্ত্তমানকালে; তিনি করেন না—সেও বর্ত্তমানে; কিন্তু তিনি করেন নাই—একেবারে অতীতের কথা। ঐরূপ অতীত-বার্ত্তাসূচক দৃষ্টান্ত;—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই।

না একেলাই ক্রিয়ানাশক, কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্য একটা নিরর্থক ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাবনা', ইহাই সম্পূর্ণ উত্তর; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্য বলা হয়, 'না, আমি যাব না ক'। বাঙ্গলার এই ক' কোন্ মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। হয়ত ইহা স্বার্থে ক'।

উপরে দত্ত দৃষ্টান্তগুলির সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতেও আপত্তি নাই। 'আমি কি জানি না?' প্রশ্নকর্ত্তার জ্ঞানে যে ব্যক্তি সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ দেওয়া হয়। প্রশ্নকর্ত্তা সংশয়কারীকে জোরের সহিত বলেন, 'আমি কি না জানি!' অথবা, 'আমি না জানি কি!'—ইহার অর্থ, আমি সমস্তই জানি। আবার কখনও বা ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় 'আমি না জানি, তুমি ত জান।' এই সকল দৃষ্টান্তে না ক্রিয়ার পরে না বসিয়া পূর্ব্বে বসিয়া থাকে।

সংশয় অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সহকারে না ক্রিয়ার আগে বসিতে চায়; যথা, তিনি যদি না যান, আমি যাব; তিনি না খান, আমি খাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিরক্তি অথবা অভিমান;—যথা না হয়, না হবে; না যান, না যাবেন। বিরক্তি বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না' একটা ই-কার ডাকিয়া লয়,—না যান, নাই বা গেলেন; না খান, নাই বা খেলেন।

বলা উচিত, এই নাই গেলেন এর নাই এবং যান নাই এর নাই ঠিক এক নাই নহে। নাই গেলেন বস্তুতঃ না—ই গেলেন। এখানে ই একটা পৃথক্ শব্দ, সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন। উহা না'কে বলবত্তর করে। আর 'যান নাই'

এই দৃষ্টান্ত না'র পরবর্ত্তী ই' না'র সঙ্গে একবারে মিশিয়া আছে; উহাকে ছাড়াইয়া লইবার উপায় নাই।

না করিবার জন্য, না দেওয়ার ইচ্ছা, না যাইতে যাইতে, না দিয়া, না বলিয়া, না চড়িতে এক কাঁধি, ইত্যাদি স্থানে না' কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল স্থানাভাবে। বলা চেয়ে না বলা ভাল,—এখানেও তদ্রূপ।

এ পর্য্যন্ত না'র যত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্ব্বত্র ক্রিয়াকে পণ্ড করে। না' একাই ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ। যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'যাব না,' এত দূর বলার দরকার নাই; ঘাড় নাড়িয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট; ভাবী-ক্রিয়া ইহাতেই পণ্ড হইল। বুঝিয়া লইতে হইবে, এখানে না'র ষোল আনা অর্থ যাব না। না যখন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয়—যেমন নাঃ, যেতেই হ'ল; অথবা নাঃ, যাব না,—তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ব্ববর্ত্তী সংশয় বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের চূড়ান্ত মীমাংসা; কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়া একবারে চরম মীমাংসায় আসা গেল। "জগৎটা কিছু নাঃ" বৈরাগীর এই গায়ের জোরে মীমাংসার কাছে তার্কিকের দার্শনিক মীমাংসা নিতান্তই দুর্ব্বল। ইহা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তিবাদ।

এ পর্য্যন্ত না'কে ক্রিয়ানাশী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বস্তুরও বিশেষণ হয়, বিশেষণেরও বিশেষণ হয়। যথ—না-টক্, না-মিষ্ট; না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না-কাল; না-ঝাল, না-অম্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ সকল দৃষ্টান্তে না উভয় পদকেই নস্যাৎ করিতেছে। এককে নস্যাৎ করিয়া

অপরকে বাহাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়,—ভাল, না, মন্দ? সাদা, না, কাল? আম, না, জাম? রাম, না, শ্যাম? ঐরূপ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে এককে নস্যাৎ করিবার চেষ্টায়—যাবেন, না, থাকিবেন? খেতে হবে, না, ঘুমাতে হবে? যাবেন, না, যাবেন না? এখানে না স্পষ্টতঃ অথবা, কিংবা, এই রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে, না, যাবে না? ইহার সহিত তুল্যমূল্য—যাবে, কিংবা যাবে না? যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে—যাবে কি না?

তুমি যাবে, না, আমি যাব? আমি ফলারে যাব, তুমি পূজো করবে? না, তুমি পূজো করবে, আমি ফলারে যাব?—এই সকল প্রশ্নেও উভয় সঙ্কল্পের মধ্যে একটাকে নষ্ট করিয়া অন্যটিকে রাখিবার চেষ্টা রহিয়াছে। না এখানেও আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই। এখানেও না অর্থে অথবা।

দাদা না কি? এই সংশয়ের তাৎপর্য্য, অন্য কেহ নহে ত।

আমিই করি না কেন! তুমিই যাও না! তিনিই করুন না! এই সকল প্রশ্নে মনে হইতে পারে, না যেন তাহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। তিনিই করুন না—ইহার অর্থ, তিনিই করুন। কি আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ না'য়ের এই ধর্ম্মজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে, না'য়ের এই মতিপরিবর্ত্তনের ভিতরেও একটু গুপ্ত দুরভিসন্ধি আছে। তিনিই করুন না—ইহার গুপ্ত অর্থ, অন্যের করিয়া কাজ নাই। একজনকে অপদস্থ করিয়া, তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া, অপরকে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইতেছে। রামই খান না, ইহাতে প্রকাশ্যে রামের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ, কিন্তু অপ্রকাশ্যে শ্যামের রাখালের ও পাঁচকড়ির প্রতি ঘোর নির্দ্দয় আচরণ। তাহাদিগকে ভোজন ব্যাপারে নস্যাৎ করা হইল।

না। তাহার সেই নস্যাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার দুরভিসন্ধি, ক্রমশঃ গূঢ় করিয়া একবারে নিরীহ ভালমানুষের বেশেও দাঁড়াইতে পারে। সেখানে না। যেন একবারে হঁা।।

যথা—গেলেনই না=গেলেনই বা, করিলেনই না =করিলেনই বা। যা'ক্ না। গোল্লায়=গোল্লায় যাক্, গোল্লায় যাইতে দাও।

কর ই না=কর; খাও না=খাও। না। চিরকাল ভ্রুকুটী দ্বারা নিষেধ করিয়া আসিতেছিল। এই সকল দৃষ্টান্তে বিশেষ জোরের সহিত ও জেদের সহিত আদেশ ও অনুরোধ জানাইতেছে।

"অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে; মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্।" এ সকল দৃষ্টান্তেও না। নিরীহ উদাসীন; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু তথাপি উহার কটাক্ষপ্রান্তে একটু নষ্টামির দীপ্তি যেন বাহির হইতেছে।

না'র নিকট সম্পর্কের আর দুইটি শব্দ আছে? নাই ও নহে।

নাই'য়ের দুইটা প্রয়োগ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তিনি নাই বা গেলেন—এস্থলে নাই=না-ই; উহা বলবত্তর না। মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ—তিনি যান নাই, আমি যাই নাই। এ সকল স্থলে নাই বর্ত্তমান ক্রিয়াকে অতীতে ফেলিয়া পরে তাহাকে নস্যাৎ করিতেছে। সাহিত্যের ভাষার নাই লোকমুখে নি আকারে বাহির হয়। যথা আমি যাই নি; তুমি যাও নি, সে বলে নি।

নাই পদের তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার বিশিষ্ট প্রয়োগ। সংস্কৃত অস্তি শব্দ হইতে বাঙ্গালা আছে আসিয়াছে। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া অন্যান্য ক্রিয়ার দল ছাড়া; ইহার আচার-আচরণ কি রকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। কর। ক্রিয়ার কত রূপ! করি, করিতেছি, করিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম,

করিতাম, করিতেছিলাম, করিব, করিয়া থাকি, করিয়া আসিতেছি, করিতে হয়, করিতে হইবে, করা হইবে, করা যাইবে, করিয়া ফেলিব, করিতে, করিলে করিয়া; করিবার, ইত্যাদি। এইরূপ খাওয়া, পরা, শোয়া প্রভৃতি ক্রিয়ারও নানারূপ। কিন্তু এই দল-ছাড়া আছে ক্রিয়া কেবল বর্ত্তমানে আছি, অতীতে ছিলাম, এই দুইটি মাত্র রূপ গ্রহণ করে। পদ্যে ছিল স্থলে আছিল প্রয়োগ দেখা যায় বটে—যথা "আছিল দেউল এক অপূর্ব্ব গঠন"। কিন্তু গদ্যে ঐরূপ প্রয়োগ নাই। ইহার ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের ছিলাম আগে পিছে না' লয়;—ছিলাম না, না ছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান আছি কেবল আগে না' লইতে পারে, না আছি; কিন্তু 'আছি না' এরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত। যেখানে আছি না বলা উচিত, সেখানে বলিতে হয় নাই। আছি অর্থে অস্তি; নাই অর্থে নাস্তি। ইহা কেবল বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। পুরুষভেদে ইহার বিকার নাই,—আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা বাহুল্য, যাই নাই, খাই নাই, করি নাই, প্রভৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির নাই এক নাই নহে। ছন্দোবদ্ধ পদ্যে নাই রূপান্তরিত হইয়া নাহি হইয়া যায়, "কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের"। খাঁটি না'রও পদ্যের ভাষায় একটা হি যোগ করা রোগ আছে—যথা "বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি হয় সমরঘোষণা"। এস্থলে নাহি হয়=হয় না। নাহি আবার ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা—"অন্ন নাহিক জুটে"। এখানে নাহিক জুটে=জুটে না।

নাই'এর আর একটা চতুর্থ প্রয়োগ আছে,—যথা করিতে নাই,

খাইতে নাই, মারিতে নাই। খাইতে নাই=খাইতে হয় না= খাওয়া অনুচিত। এ স্থলে করিতে, খাইতে, মারিতে প্রভৃতি পদগুলি ইংরেজি infinitiveএর মত—বিশেষ্যপদের মত—উহারা যেন নাই ক্রিয়ার কর্ত্তা। খাইতে হয় এবং তাহার উলটা খাইতে নাই—যথাক্রমে বিধি ও নিষেধ বুঝায়।

না'য়ের অপর কুটুম্ব নহে। এ একটি অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক পদ। আমি নহি (নই), তুমি নহ (নও); সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন্)। সমস্তই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না; পদ্যে নহিব কদাচিৎ দেখা যায়। সংস্কৃত ভূধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা হওয়া ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না-যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ নহি'র উৎপত্তি। মারা, ধরা ও রাখা'র মত নহা প্রচলিত দেখি না।

নিকট সম্পর্কের আর একটি শব্দ নহিলে (নইলে) সম্ভবতঃ না—হইলে=নহিলে। সংস্কৃত বিনা শব্দ সাহিত্যে আছে, লোকমুখে বিনা অর্থে নইলের ব্যবস্থা। উহাকে বাঙ্গলা অব্যয়ের শ্রেণিতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে, প্রভৃতির সঙ্গে এক শ্রেণিতে বসিবে। ঘুমাও, নইলে (ঘুম না হইলে) অসুখ হবে,—এস্থলে নইলে=নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি=পারি না;—আমি নারি, সে নারে। ইহার প্রয়োগ পদ্যেই বেশী, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যের ভাষায় প্রয়োগ দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিছে, প্রভৃতি রূপের ভূরিপ্রয়োগ মাইকেল মধুসূদন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচনা করেন। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করেন। আমি সে সময়ে পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে আমি যে কয়টি কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা গেল।]

খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অর্থ বিচারকালে ও ব্যুৎপত্তি বিচার কালে কোন একটা প্রদেশের উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে চলিবে না। সম্ভবতঃ এই শ্রেণির শব্দের অধিকাংশই কোনরূপ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সেই প্রাকৃত উচ্চারণ কি ছিল, তাহা এখন বলা কঠিন। হয় ত কোন স্থানে পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চারণ সেই মূল উচ্চারণের নিকটবর্ত্তী; কোন স্থানে হয় ত পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ অধিক নিকট। বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ একত্র মিলাইলে সেই মূল উচ্চারণ ধরা পড়িতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। মনে কর জা লি য়া শব্দ। জে লে লিখিলেও ইহার ঠিক্ চলিত উচ্চারণ প্রকাশ পায় না; কেহ হয় ত জে’লে এইরূপ লিখিয়া, অর্থাৎ মাঝে একটা (’) চিহ্ন দিয়া, উহার উচ্চারণ প্রকাশ করিতে চাহিবেন। প্রদেশভেদে ইহার উচ্চারণ জ’লে। বা জো’লে।। সম্ভবতঃ মূল শব্দ জা লি ক। সংস্কৃত ক’ প্রাকৃতে অ’ হইয়া যায়। বাঙ্গলায় আবার শব্দের অন্ত্য স্বরটা দীর্ঘ হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রাচীন বাঙ্গলা জা লি আ। হওয়াই সম্ভব। প্রাচীন পুঁথির সাক্ষ্য এই অনুমানের পক্ষে।

প্রাচীন জা লি অ। আধুনিক কালে প্রদেশভেদে জে'লে জো'লে প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। অন্ত্য স্বর অর্থাৎ আ' যে লোপ পাইয়াছে, তাহা আধুনিক ট্যারচা উচ্চারণেও প্রকাশ পায়; সেই লোপটা বুঝাইবার জন্য মাঝে একটা স্বরলোপের চিহ্ন (') দিতে হইতেছে। ফলে এই শ্রেণির শব্দের চলিত উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন; বানান দ্বারা সেই উচ্চারণের ভেদের ঠিক প্রকাশ চলে না। এই গোলযোগ হইতে অব্যাহতির জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্গলা শব্দের তালিকার ই অ। প্রত্যয় দিয়া 'জা লি অ।' এইরূপ বানান করিয়াছেন। তাহার কারণ যে এইরূপ লিখিলে কোন প্রদেশবিশেষের প্রতি পক্ষপাত হইবে না, এবং মূল অর্থাৎ প্রাচীন উচ্চারণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

সম্প্রতি যে সকল লেখক এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের চলিত উচ্চারণ ধরিয়াই আলোচনা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে ভ্রমের আশঙ্কা অধিক থাকিবে না, এবং বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ মিলাইয়া প্রাচীন উচ্চারণটার নিকটে পৌঁছিবারও সুবিধা হইবে। মূল উচ্চারণটি যতক্ষণ না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ প্রত্যয়টি কি, ঠিক জানা যাইবে না। প্রত্যেক শব্দের যতগুলি প্রাদেশিক উচ্চারণ, ততগুলি প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। মূল উচ্চারণ বাহির করিয়া মূল প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তার পর সেই মূল বাঙ্গলা প্রত্যয় কোন্ প্রাকৃত বা সংস্কৃত প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে, তাহা স্থির হইবে।

মি ঠা, তি ত া, উ চ া—এখানে মূল প্রত্যয় স্পষ্টতই আ'। বাঙ্গলা বিশেষণ শব্দের আকারান্ত হওয়াই স্বভাব। এ কথা আমি ব্যোমকেশ বাবুকে এক সময় বলিয়াছিলাম; তিনি তদনুসারে আকারান্ত বাঙ্গলা বিশেষণ শব্দের একটা তালিকা পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন।

যখন শেষ অক্ষরটা যুক্ত অক্ষর ভাঙ্গিয়া উৎপন্ন হয়, তখন একটা আ-কার আসিয়া বসে। মিষ্ট তিক্ত উচ্চ এই তিনের যুক্ত বর্ণ ভাঙ্গিয়া আকার আসিয়াছে; সেই আকার মোলায়েম হইয়া এ' উ' প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। সিধা যদি শুদ্ধ হইতে আসিয়া থাকে, তবে এখানেও ঐ কথা। মুলো কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না, কিন্তু ইহার প্রত্যয় যে বাঙ্গলার প্রচলিত আ' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আ' মোলায়েম হইয়া ও' হইয়াছে মাত্র।

স্বার্থে ক' বাঙ্গলায় আ' হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে বাঙ্গলা আ' প্রত্যয় সংস্কৃত ক' হইতে উৎপন্ন। ক' মাত্রকেই যে আ' হইতে হইবে, এমন নহে। শৌণ্ডিক এখন শুঁড়ি বা শুঁড়ী; ক' এখানে লুপ্ত; কিন্তু প্রাচীন মূর্ত্তি শুঁড়িআ বা শুঁড়িঅ ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। হিন্দির সাক্ষ্য এখানে প্রামাণিক হইতে পারে। স্বার্থে ক' ও ক্ষুদ্রার্থে বা অল্পার্থে ক', এই দুই ক-কারে অধিক প্রভেদ নাই। বাঙ্গলাতে দুই ক'ই আ-কারে পরিণত হইয়াছে। পাগলা বামনা এমন কি রামা শ্যামা হ'রে (=হরিআ) প্রভৃতির আ-কার ক্ষুদ্রার্থ ক' বা অবজ্ঞাবাচী ক' হইতে উৎপন্ন।

মাটিয়া বালিয়া প্রভৃতি শব্দ এবং জঙ্গলিয়া প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়ে ফেলা চলিবে না। মাটি ও বালি ইহাদের ই-কার প্রত্যয়ের ই-কার নহে। মৃত্তির ই-কার মাটি'তে বর্ত্তমান; বালু'র উ-কার বালি'তে ইকারে পরিণত। কিন্তু জঙ্গলিয়া'র ই-কার প্রত্যয়ের ই-কার; এবং এই প্রত্যয় ইয়া=ইআ না লিখিয়া ই+আ লেখাই সঙ্গত। বিশেষ্য জঙ্গল হইতে বিশেষণ জঙ্গলি (জঙ্গলবাসী); তাহাই আবার স্বার্থে জঙ্গলিআ; শেষ পরিণতি জঙ্গুলে। এখানে আ' বোধ করি ক' হইতে উৎপন্ন। আর যদি

সংস্কৃত ই ক (ষ্ণিক) হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ই+আ না হইয়া ই অ৷ হইবে। মা টি য়া বা লি য়া ইহাদের আ' বিশিষ্টার্থ-বাচী ; স্বার্থবাচী নহে ; তাহাদের মূলও সম্ভবতঃ পৃথক্।

দে ন া=যাহা দিতে হইবে

পা ও না=যাহা পাওয়া যাইবে

খে ল না=যাহা দ্বারা খেলা যায়

বা ট না=যাহা বাঁটা যায়

বা জ না=যাহা দ্বারা বা যাহা বাজান যায়

ঢা ক না=যাহা দ্বারা ঢাকা যায়

এই সমুদয়কে এক শ্রেণিতে ফেলা চলিবে না। শেষ শব্দ চারিটির না বোধ করি সংস্কৃত অ ন (=অনট্) প্রত্যয়ের সম্পর্ক রাখে। সেখানে প্রত্যয়কে 'ন া' না বলিয়া 'অ ন+অ া' বলা উচিত। কিন্তু দেনা পাওনা র না' কোথা হইতে আসিল? শু কৃ না' র না'রও বোধ করি অন্য মূল।

ই প্রত্যয়ের নানা অর্থভেদ। নানা অর্থে প্রযুক্ত ই প্রত্যয় বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন। আবার ই' লিখিব কি ঈ' লিখিব, তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত। দি দি তে আপত্তি নাই, কিন্তু মা সি লিখিব কি মা সী লিখিব, মা মি লিখিব কি মা মী লিখিব, ইহা লইয়া উভয়পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিবাদ ক লু নী মা লি নী প্রভৃতির নী'তেও উঠিয়াছে। উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে। আমি মীমাংসায় অক্ষম।

তবে নবাবী মাষ্টারী জমীদারী ওকালতী প্রভৃতির ঈ' কে ই-কারে পরিণত করিবার সময় বোধ হয় যায় নাই। এরূপ দৃষ্টান্তে অকারণে ঈ-কারের বোঝা বহিয়া লাভ কি?

খাঁটি বাঙ্গলায় যখন হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদ নাই, তখন খাঁটি বাঙ্গলা

লিপিমালায় উহাদের একটাকে বিসর্জ্জন দিলে হানি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত তালিকা দেখিলে বোধ হয় যে তিনি এইরূপ বিসর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

রবিবাবু যে সকল প্রত্যয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই তিন ভাগ করিয়াছেন, তাহার কারণ এখন বুঝা যাইবে। কলিকাতার উচ্চারণ বা কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ ধরিলে ঐরূপ খণ্ডীকরণের হেতু না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অর্থ ধরিয়া মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ঐরূপে ভাঙ্গা আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ব্যোমকেশ বাবু যে সকল নূতন প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন, অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে অনেকগুলিই ঐরূপ বিশ্লেষণযোগ্য। ল ম্বা ই চৌ ড়া ই এই দুই বিশেষ্য পদ ল ম্বা চৌ ড়া এই দুই বিশেষণ পদে ই-কার যোগে উৎপন্ন; এখানে প্রত্যয় ই; আ ই নহে। কিন্তু বা ছা ই= বাছ+আ+ই। বা ছ ধাতু হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ছা; স্বার্থে বা ছা ই। অবার ঢা কা ই=ঢা কা+ই (ঢাকাতে উৎপন্ন); এখানে ই' প্রত্যয়ের অন্য অর্থ। ব্যোমকেশ বাবুর দত্ত দৃষ্টান্তগুলি অনেক স্থলে এইরূপ বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ব্যাকরণ আলোচনার ফলে সাহিত্য-সমাজে অনেকের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন বুঝি বা বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধিনাশই এক দল লেখকের অভিপ্রায়। বাঙ্গলাব্যাকরণঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎসভায় পঠিত বা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের দুইজন সহকারী সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রণী হইয়া এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাঙ্গলা শব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইয়াছে। এই শ্রেণির শব্দের একটি তালিকা, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পত্রিকাসম্পাদক নগেন্দ্র বাবুও এই শ্রেণির শব্দ সংগ্রহের জন্য পাঠকগণকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই সকল শব্দের অধিকাংশই চলিত ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের অনেকেরই সাধুভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় সম্প্রতি স্থান নাই। হয় ত তাহাদের মধ্যে অনেক শব্দ এরূপ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অর্থাৎ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তায় বর্জ্জনীয়। এই সকল 'অসাধু' শব্দের আলোচনা সকলের প্রীতিকর হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক ব্যাকরণবিষয়ে অব্যবসায়ী; উপস্থিত বিতণ্ডায় আমার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যখন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এই আন্দোলন উপস্থিতির জন্য বিশেষতঃ দায়ী, তখন পরিষৎ-সম্পাদকেরও আত্মসমর্থন স্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক বোধ

করিতেছি। পরিষৎ-পত্রিকার দ্বারা যদি ভাষার বিশুদ্ধিহানি বা সৌষ্ঠব-হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পত্রিকার সেই দোষ মার্জ্জনীয় হইবে না। অতএব যখন এরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার কোন মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক, এবং যদি মূল থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উৎপাটন বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই আতঙ্কের কোনই মূল নাই। বাদী ও প্রতিবাদী যাঁহারা বিতণ্ডায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই বোধ হইবে, ইহার কোন মূল নাই। সাহিত্যপরিষদে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে সকলেই একমত; একমত না হইয়া উপায় নাই। অথচ সম্পূর্ণ ঐকমত্য সত্ত্বেও অবান্তর প্রসঙ্গ বহু পরিমাণে উপস্থিত হইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিতণ্ডায় বুঝি ইহাই সনাতন নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য-সমাজের সুধীগণ স্থূলতঃ দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী; তাঁহারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখিতে, এমন কি, সেই পার্থক্য বাড়াইতে চাহেন। লৌকিক ভাষাকে তাঁহারা কতকটা কৃপার ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; লৌকিক ভাষা নইলে সংসারযাত্রা চলে না, তাই লৌকিক ভাষাটা চলুক। কিন্তু সাহিত্য তাহার আক্রমণ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থান করুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। লৌকিক ভাষাটা গৃহকর্ম্মে ও সংসারযাত্রায় আবশ্যক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে উহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। যে সকল খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ লৌকিক ভাষার সম্পত্তি, উহা সংস্কৃতমূলক হউক আর দেশজই হউক, উহাদের যথাসাধ্য বর্জ্জন কর, নতুবা সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা হইবে না।

অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে এই পার্থক্য

রাখিতে চাহেন না। ইহাঁরা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিরূপ। ইহাঁদের প্রধান যুক্তি যে ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় লোকশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তাহাই সার্থক ভাষা। যে ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিবে, আর মূর্খে বুঝিবে না, সে ভাষার অস্তিত্ব অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক। কাজেই সাহিত্যের জন্য একটা দুর্বোধ্য ভাষা এবং দৈনিক ব্যবহারের জন্য আর একটা সুবোধ্য ভাষা, এই দুই ভাষা রাখিবার দরকার নাই।

উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে; এবং বোধ করি উভয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই শ্রেয়ঃ হইতে পারে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসই কতকটা এইরূপ মধ্য পথ অবলম্বনের সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্য সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সর্ব্ব সাধারণের জন্যই তাঁহাদের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যও সর্ব্ব সাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। সে কালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ছিলেন; প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের বিরূপ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা বাঙ্গলা স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতেন, তাঁহারা সাধারণের জন্যই লিখিতেন, এবং সরল লৌকিক ভাষাতেই যথাসাধ্য লিখিতেন। প্রাদেশিক শ্রোতার ও পাঠকের জন্য লিখিত হইত বলিয়া উহা প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিতও হইত না।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিত সাধু বাঙ্গলা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাঙ্গলা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা

সাধু ভাষা হইল বটে, ও সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিকত্বরহিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানতঃ উহা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিল।

অতঃপর যাঁহারা বঙ্গভাষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতগণকে অগ্রণী দেখিতে পাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম এই ব্যাপারে স্মরণীয় হইয়াছে। ইহাঁদের অনেকের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের জন্য এই সকল মনস্বী ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের ভাষার ইহাঁরা জন্মদাতা না হইলেও ভাষার শৈশবকালে বিনয়াধান রক্ষণ ও ভরণের জন্য ইহাঁরাই সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্থলীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম এতন্মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতশব্দবাহুল্য সম্বন্ধে দুই মত থাকিবারই কথা; এবং এক পক্ষ অপর পক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবেন, তাহাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই। গদ্যরচনায় বাক্যবিন্যাসের ও বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসের রীতি, ইংরেজিতে যাহাকে syntax বলে, সেই পদবিন্যাসরীতির সংস্কার এই সকল পণ্ডিতের প্রতিভা হইতেই ঘটিয়াছিল; এবং এই মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও পদসন্নিবেশ রীতি ব্যতীত উত্তরকালে বাঙ্গালায় গদ্যরচনা উৎকর্ষ লাভ করিত না। ইহার ত্রুটিতেই রাজা রামমোহন রায়ের রচনা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে নাই; এবং এই জন্যই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল

মিত্র প্রভৃতির সারগর্ভ সন্দর্ভসকলও সাধারণের নিকট স্থায়ী সমাদর পায় নাই।

পক্ষান্তরে টেকচাঁদ ঠাকুরের ও হুতোমের বাঙ্গলা লৌকিক বাঙ্গলা হইতে অভিন্ন; কিন্তু উহাও যে সর্ব্বত্র সাহিত্যের বাঙ্গলা হইতে পারে না, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গিয়াছে।

উত্তর কালের লেখকগণ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্যের ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত হইয়াছে। এই মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলা ভাষার ক্ষমতা যে কত দূর-প্রসারী হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

ফলে সাহিত্যের ভাষা কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া চলিবে, তাহা কার্য্যতঃ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে; এবিষয় লইয়া এখন বাদবিতণ্ডা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র। তবে প্রাণবানের প্রাণের স্ফূর্ত্তি অন্য কাজ না পাইলে ক্রীড়াচ্ছলেও আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়; তাই আমাদের সুধীগণের পাণ্ডিত্য যখন অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ পায় না, তখন এই ক্রীড়াবিতণ্ডার আশ্রয় লইয়া আপনার ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ করে মাত্র। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপে ও কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে, এবিষয়ে কার্য্যতঃ যে বিশেষ মতভেদ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না উভয় পক্ষই প্রয়োগকালে এক শ্রেণির ভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সামান্য প্রভেদ থাকে, তাহা ব্যক্তিগত। তবে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই দলে সাজিয়া যুদ্ধার্থ দাঁড়ান, তাহা প্রকৃত যুদ্ধ নহে, যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

সম্প্রতি সংস্কৃত কালেজের পুরাতন ছাত্র ও বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বগামীদের অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্যই যেন সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত-শব্দ প্রয়োগের

প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, খাঁটি বাঙ্গলা 'তেল' শব্দ ব্যবহার করিলে যখন সকলেই বুঝে, এবং লৌকিক প্রয়োগে যখন সর্ব্বদা 'তেল' শব্দেরই ব্যবহার আছে, তখন সাহিত্যের ভাষায় 'তৈল' ব্যবহার করিয়া লেখকের ও মুদ্রাকরের পরিশ্রম অকারণে বাড়ানতে লাভ কি ?

আমরাও বলি, ঠিক্ কথা; অকারণে ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া লাভ কি? অথবা অকারণে পরিশ্রম বাড়াইবারই বা সার্থকতা কি ? 'তেল' শব্দ অশ্লীলও নহে, অশ্রাব্যও নহে; ভদ্রসমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও তেলই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে 'তৈল' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন তাহাতেও তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইব না।

কেন না, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা হইলেও উহার আর একটা উদ্দেশ্য আছে; উহাকে রসসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের একটা অংশ আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে; উহা গুণীর জন্য ও অভিজ্ঞের জন্য ও কলাবতের জন্য ও সমজদারের জন্য। সেক্সপীয়রের কাব্য সর্ব্ব সাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই; সর্ব্বসাধারণ উহার রসবত্তা আস্বাদনে অধিকারী নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সকল তৎকালে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমজদারের জন্য রসসৃষ্টি। কুমারসম্ভবের "ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী" ইত্যাদি শ্লোকসপ্তক যতবার পড়িয়াছি, কি কারণে জানি না, আমার অন্তরিন্দ্রিয় মোহগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ কয়েকটি শ্লোকে বিশেষ কোন ভাবগাম্ভীর্য্য আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার ললিতগম্ভীর পদবিন্যাসজাত ধ্বনি যে এই মোহোৎপত্তির একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ করি না।

সাহিত্যের একাংশের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি; আধুনিক বাঙ্গলা লেখকগণ *মুখ্যতঃ রসসৃষ্টির জন্য সংস্কৃতশব্দসম্পত্তির* সাহায্য লইয়া থাকেন। *বলা বাহুল্য, সুনির্ব্বাচিত ও সুবিন্যস্ত সংস্কৃত শব্দের* যেমন উন্মাদনা আছে, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের নাই। ইহার মূল অনুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ইহার মুখ্য কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির সহিত অন্যান্য কারণ জড়িত আছে, সন্দেহ নাই।

সুতরাং সাহিত্যের ভাষার বলবিধানার্থ ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ সংস্কৃতশব্দ-সম্পদের গৌরব আছে ও চিরকালই থাকিবে, অজ্জন্য ক্ষুব্ধ কিংবা দুঃখিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। অকুণ্ঠিতভাবে সেই ভাণ্ডার লুঠ করিয়া আমাদের বাঙ্গলা ভাষার শরীরে অলঙ্কার পরাও, কেহই চৌর্য্যবৃত্তির জন্য দণ্ডিত করিবে না।

কিন্তু এইখানে একটু তর্ক আসিয়া পড়িবে। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য সাধিত হইতে পারে না, ইহা স্বীকারে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন। ইংরেজি দৃষ্টান্ত সম্মুখে আছে। অনেক ইংরেজি লেখক ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য মুখভরা গালভরা বিজাতীয় লাটিন শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন; প্রচলিত দৃষ্টান্ত জনসনের ভাষা। কিন্তু অনেকে আবার খাঁটি ইংরেজি, যাহাকে নিতান্ত homely আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াও মধুর ললিত সুন্দর রচনা করিয়াছেন। ইংরেজি বাইবেলের ভাষা, যাহাতে গালভরা লাটিন শব্দের স্থান নাই বলিলেই চলে, সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে সেই ভাষা ইংরেজি সাহিত্যে অদ্বিতীয়। লাটিন শব্দের আড়ম্বর না থাকিলেও টেনিসনের লকসি হলের ভাষায় ছন্দের ধ্বনি কাণে মেঘগর্জ্জনের মত

বাজিতে থাকে ; সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দও অনেক সময় তাহার নিকট হারি মানে। যাঁহারা প্রতিভাবান্, যাঁহারা ক্ষমতাবান্, যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের হাতে ঘোষবান্ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন নাই; চলিত বাঙ্গলা শব্দেরই সাহায্য লইয়া তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে রস সৃষ্টি করিতে পারেন। রসসৃষ্টি কেবল যে শব্দের গুণে হয় এমন নহে ; শব্দ নির্ব্বাচন ও শব্দ বিন্যাসের গুণেও হয়। ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে সকলই সম্ভব ; দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা রস পাইতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা কৃপাপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভারতী পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভাষা হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গলায় যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ চলে; হিন্দী প্রভৃতিতে চলে না। ভাষার এইরূপ নমনীয়তা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শব্দ লইয়া যদি সম্পত্তি বাড়ান চলে ও তাহাতে কোন বিঘ্ন না থাকে, তাহাতে মন্দ কি? কিন্তু অনেকে হয় ত পালটাইয়া বলিবেন, উহা বাঙ্গলা ভাষার দুর্ব্বলতার চিহ্ন। যে ভাষা অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ না করিয়া কাজ চালাইতে পারে না, সে ভাষা সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। বাঙ্গলা ভাষা যে দুর্ব্বল, তাহার নানা লক্ষণ আছে। বাঙ্গলায় রাগ করা চলে না, গালি দেওয়া চলে না। রাগ করিতে হইলেই আমরা হিন্দির সাহায্য লই; ইংরেজিনবিশ লোকে ইংরেজি চালান। ইহা বাঙ্গলার পক্ষে উৎকর্ষের চিহ্ন নহে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এরূপ আবদার করিবেন না, যে সাহিত্যের ভাষায় গালি দিবার কোন কালে প্রয়োজন হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তখন সংস্কৃতশব্দভূষিত সাধু ভাষা কতটা সফল হইবে, বিবেচ্য বটে। চোরকে

ডাকিবার সময় 'ওরে চোর' না বলিয়া 'অরে চৌর' বলিতে পণ্ডিত মহাশয়েরাও কুণ্ঠিত হইবেন।

বিশুদ্ধিবিচারের পূর্ব্বে বিশুদ্ধি কাহাকে বলে, বুঝিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। সাহিত্যের ভাষাতেও আছে; কথাবার্ত্তার ভাষাতেও আছে। এই সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ; বাঙ্গলা ভাষা তাহা সংস্কৃতের নিকট পাইয়াছে। কতক উত্তরাধিকারসূত্রে অতি পুরাকাল হইতেই দখল করিয়া আসিতেছে; কতক আধুনিক কালে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগ্রহণ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই অব্যাহত ভাবে চলিবে; অব্যাহত ভাবে—কেননা ইহাতে সুদও লাগে না, এবং পরিশোধেরও প্রয়োজন নাই; উত্তমর্ণের দ্বার উন্মুক্ত; অধমর্ণেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

কিন্তু এই সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও অনেক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান, এইগুলিকে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বলা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ বাঙ্গলা ভাষার শরীরে অস্থিমজ্জায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহাদিগকে বর্জ্জনের উপায় নাই। বাঙ্গলা লিখিতেই হউক আর বলিতেই হউক, ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। বরং যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অনেকটা বর্জ্জন চলিতে পারে; তাহাদিগের স্থলে সংস্কৃত শব্দ বসাইতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের স্থলে কোনই উপায় নাই। এখানে তাহাদের আশ্রয় লইতেই হইবে; নতুবা বাঙ্গলা, এমন কি, 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গলাও, রচিত হইবে না।

"আমি মাছ খাইতেছি" এ স্থলে মাছকে মৎস্যে ও খাইতেছি'কে ভোজন করিতেছি'তে রূপান্তরিত করিয়া ভাষাকে 'বিশুদ্ধতর' করা যাইতে না পারে এমন নহে। কিন্তু এই 'আমি' এবং 'করিতেছি' এই দুয়ের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কোন পণ্ডিতই নির্দ্দেশ করিতে পারি-

বেন না। কেবল কথাবার্ত্তার সময়েই নহে, বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার সময়েও অব্যাহতির আশা নাই। অতএব বাঙ্গলা ভাষাতে কতকগুলি শব্দ থাকিবেই, যথা 'আমি' ও 'করিতেছি', যাহা সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু সংস্কৃত নহে, যাহা খাঁটি বাঙ্গলা।

এইরূপ খাঁটি বাঙ্গলা ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে আমাদের আধুনিক ভাষা গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা শব্দরাশিকে এই দুই প্রধান ভাগে সাজাইতে পারা যায়। প্রশ্ন এই যে এই দুই শ্রেণির মধ্যে কোন্ শ্রেণি 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গলা?

কেহ হয় ত বলিবেন সংস্কৃতশব্দগুলি বিশুদ্ধ, আর খাঁটি বাঙ্গলা শব্দগুলি অবিশুদ্ধ। এক শ্রেণির শব্দগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিতে পারা যায়; এই হিসাবে উহারা বিশুদ্ধ বটে। অন্য শ্রেণির শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সাধিতে পারা যায় না; এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই হিসাবে কি উহারা অবিশুদ্ধ? কথনই না। 'আমি' ও 'করিতেছি' সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় উহাদের বিশুদ্ধিপক্ষে কেহ এ পর্য্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত করেন নাই; কেন না উহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে সমর্থ হন নাই।

কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।

আবার অন্য পক্ষ বলিবেন, 'আমি' ও 'করিতেছি' এই দুইটি শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শব্দ; 'মাছ' ও 'খাইতেছি' এই দুইটাও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শব্দ। কিন্তু 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুইটি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা নহে। এমন কি, 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুই শব্দ বাঙ্গলাই নহে; উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ; বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উহাদিগকে ধার করিয়াছে মাত্র। এই যুক্তিও ফেলিবার নহে। 'মৎস্য' ও 'ভোজন' শব্দ বর্জ্জন

করিয়া বাঙ্গলায়,—বিশুদ্ধ বাঙ্গলায়,— লেখা ও কথা কহা চলিতে পারে, কিন্তু 'আমি' ও 'করিতেছি' ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে কোন বাঙ্গলারই অস্তিত্ব থাকে না।

এই ত গেল সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে। তার পর আছে কথাবার্ত্তার ভাষা। কথাবার্ত্তার ভাষাতেও দুই শ্রেণির শব্দ বর্ত্তমান আছে; খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ। খাঁটি বাঙ্গলা নইলে কথা কহা অসাধ্য হয়; এবং খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সম্পূর্ণ বর্জ্জনও বোধ করি অসাধ্য। যদি কাহারও সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকে, একবার বাজি রাখিয়া চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ কথাবার্ত্তার ভাষাতেও উভয় শ্রেণির শব্দেরই প্রচলন আছে; তবে উভয়ের সংখ্যার তারতম্য স্থানভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন।

প্রভেদ এই যে কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বত্রই খাঁটি সংস্কৃতের অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গলার প্রচলন অধিক। অবশ্য স্থানভেদে ও কালভেদে ইতরবিশেষের কথা মনে রাখিতেই হইবে। সে কালের অপেক্ষা বোধ হয় একালে খাঁটি সংস্কৃতের প্রচলন বাড়িয়াছে। বোধ হয় মাত্র, কেন না, নিশ্চয় জানি না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা দেখিয়াই ও কালের গতি দেখিয়াই সেকালের চলিত ভাষার অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আবার একালেও শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তার ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, অশিক্ষিত সমাজে বা নিম্নসমাজে তত হইতে পারে না। আবার পরদার বাহিরে যত হয়, পরদার আড়ালে তত হয় না। আবার এক প্রদেশে যত হয়, পণ্ডিতপ্রধান স্থানে যত হয়, পণ্ডিতহীন প্রদেশে তত হয় না। স্থানভেদে ও কালভেদে ও সমাজের স্তরভেদে ও বক্তার সাময়িক অবস্থাভেদে এরূপ ইতরবিশেষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ হইবারই কথা। এদেশেও এইরূপ, অন্য দেশেও এইরূপ। ইহা 'সার্ব্বভৌমিক' নিয়ম।

শিষ্টসমাজে সুধীগণ যখন শিষ্ট ভাষায় শিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেন, তখনও বোধ করি তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় খাঁটি সংস্কৃত অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গলাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অশিক্ষিত সমাজে অশিষ্ট লোকে যখন জ্ঞানতঃ অসাধু ভাষা ব্যবহার করে, তখন যে খাঁটি বাঙ্গলারই প্রাধান্য থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। কথাবার্ত্তার ভাষায় খাঁটি বাঙ্গলার প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা এজন্য দুঃখিত, তাঁহারা হয়ত আশা করেন যে 'প্রাচীনা বঙ্গভূমির এই পুরাতন সমাজের ভবিষ্যতে ঈদৃশ শুভদিন আগমন করিবেক, যখন নিরক্ষর কৃষকবালক অবাধ্য ধেনুবৎসকে তিরস্কারকালে সাধু ভাষার প্রয়োগ করিবেক, হট্টমধ্যে পণ্যবীথিকাপার্শ্বে উপবিষ্টা মৎস্যজীবিনী কলহব্যপদেশে অসাধ্বী ভাষার প্রয়োগে কুণ্ঠিতা হইবেক, এবং গৌড়ীয় ভাষার কোষগ্রন্থসকল প্রাকৃত শব্দের দুর্ব্বহভারবহনের শ্রমস্বীকারে অব্যাহতি পাইবেক।' কিন্তু যতদিন সেই 'সুদূরপরাহত' শুভদিন 'উপাগত' না হইতেছে, ততদিন আমাদিগকে ম্লানমুখে স্বীকার করিতেই হইবে যে, কথোপকথনের ভাষায় 'প্রাকৃত গৌড়ীয়' শব্দের প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে।

এই কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের সংখ্যা কত? কেহই বলিতে পারেন না। সংখ্যানিরূপণের চেষ্টাই এপর্য্যন্ত হয় নাই। সংখ্যানিরূপণ অতি বৃহৎ ব্যাপার; কেন না অসংখ্য প্রাদেশিক শব্দ, যাহা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, যাহা সঙ্কীর্ণ প্রদেশমধ্যে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্রেণির মধ্যে আসিবে। আবার অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ, যাহা চাষার ব্যবসায়ে, তাঁতির ব্যবসায়ে, মুদির ও ময়রার ব্যবসায়ে, আদালতে, জমিদারি সেরেস্তায়, এইরূপ নানাস্থানে প্রচলিত, তাহা সেই সেই শ্রেণিবিশেষের মধ্যেই চলিত আছে; অপর সাধারণের নিকট সেই সকল শব্দরাশি পরিচিতও নহে এবং সুবোধ্যও নহে। কিন্তু সেই শব্দরাশিও এই শ্রেণির বাঙ্গলা শব্দের মধ্যেই আসিবে। এই বিশাল শব্দ-

সমূহের সংখ্যানির্দ্দেশ অল্প জনের বা অল্প দিনের কাজ নহে। বহুকালের ও বহুজনের সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্য কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গলা ভাষার *ধাতু কি, মজ্জা কি, শোণিত কি, অস্থি কি*, তাহার নিরূপণ হইবে না।

এই শব্দরাশির মধ্যে কতিপয় শব্দ বিদেশ হইতে বিজাতীয় লোকের সংস্রবে বাঙ্গলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও সাহিত্যের মধ্যে তুলনায় মুষ্টিমেয়। অবশিষ্ট সমস্ত শব্দ আবার দুই শ্রেণির। কতক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়া ঐ সকল শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দই একবারে বিকৃত হইয়াছে, অথবা সংস্কৃত শব্দ ক্রমশঃ প্রাচীন প্রাকৃতে ও প্রাচীন প্রাকৃত হইতে আধুনিক প্রাকৃতে বা বাঙ্গলায় পরিণত হইয়াছে। এক শ্রেণির পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষা, যাহা পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যেরা আলোচনা করিয়াছেন ও যাহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শরীরবদ্ধ হইয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা কস্মিন্ কালে জনসমাজে লোকমুখে কথাবার্ত্তার ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। কাজেই তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া প্রাকৃত বা বাঙ্গলা উৎপন্ন হয় নাই; প্রাচীন কালে প্রচলিত কোন লৌকিক ভাষা বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত বাঙ্গলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সে বিচারে এখানে প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে একটা প্রাচীন ভাষা ছিল সন্দেহ নাই; সেই ভাষাই কালসহকারে বিকৃত হইয়া প্রাচীন প্রাকৃতে ও আধুনিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার কেহ করিবেন না। আমরা যাহাকে সংস্কৃতমূলক বাঙ্গলা শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই এইরূপে উৎপন্ন।

কিন্তু এই সংস্কৃতমূলক খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যতীত আর একশ্রেণির বাঙ্গলা শব্দ আছে, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নির্ণয় করিতে

পারা যায় না; সংস্কৃত কোন শব্দের সহিতই তাহাদের জাতিগত সম্বন্ধ নাই; এই সকল শব্দকে দেশজ শব্দ বলা হয়। এই শ্রেণির শব্দের মূল কি, আমরা জানি না। হয় ত সংস্কৃত শব্দই এত বিকার লাভ করিয়াছে, যে এখন আর তাহাদের চেনা কঠিন। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ দেশজস্বরূপে গৃহীত বহু শব্দের সংস্কৃত মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা প্রকৃতই দেশজ অর্থাৎ যাহা সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

হইতে পারে যে বাঙ্গলা দেশে অনার্য্য মোগল দ্রাবিড় বা অন্য কোন বংশের আদিম নিবাসী যাহারা ছিল, তাহাদেরই ভাষা হইতে এই সকল শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। আর্য্যাধিকারের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয় ত এখনও নিম্নশ্রেণির লোকের ভাষা ও আরণ্য ও পার্ব্বত্য লোকদিগের ভাষা আলোচনা করিলে অনেক খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

কোন্ শ্রেণির শব্দ সংখ্যায় অধিক, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দেশজ শব্দের ব্যবহার কেবল লোকমুখেই চলিত, এমন নহে; সাহিত্যের ভাষাতেও উহারা প্রচুর পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে। সাহিত্যে উহাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু বহু দেশজ শব্দ যে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহা সত্য কথা; এবং তাহাদের প্রবেশ নিষেধেরও উপায় দেখি না।

ফলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষা উভয়েই খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বিদ্যমান। কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। আবার খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের মধ্যে কতক সংস্কৃতমূলক, এবং কতক দেশজ; এবং এই উভয় শ্রেণির বাঙ্গলা শব্দই সাহিত্যের ভাষায় ও চলিত

ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক বাঙ্গলা শব্দের প্রাধান্য চলিত ভাষায় অধিক; সাহিত্যের ভাষায় উহাদের প্রাধান্য নাই, থাকা উচিতও নহে। আধুনিক কালের যে সকল গ্রন্থকার সাবধান, তাঁহারা সাধ্যমত প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জনেরই চেষ্টা করেন। কেন না, একালে সকলেই সমস্ত দেশের জন্য লিখিয়া থাকেন, প্রদেশ-বিশেষের জন্য কেহ লেখেন না।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় আর একটা পার্থক্য আছে, উহা উচ্চারণ লইয়া। যেমন 'করিতেছি' 'খাইতেছি' এই দুইটি খাঁটি বাঙ্গলা ক্রিয়া পদ; ইহারা সাহিত্যে ঐ আকারে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কথা কহিবার সময় আমরা সুবিধামত উচ্চারণের জন্য 'করছি' 'খাচ্ছি' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। এই উচ্চারণ আবার প্রদেশভেদে বিভিন্ন; অতএব সাহিত্যের ভাষায় এই প্রাদেশিকত্বের বর্জ্জনই প্রার্থনীয়।

দ্বিবিধ বাঙ্গলার আলোচনা করিতেছি,—সাহিত্যের বাঙ্গলা ও লৌকিক বাঙ্গলা। লৌকিক বাঙ্গলা অর্থে লোকমুখে প্রচলিত কথাবার্ত্তার বাঙ্গলা। দেখা গেল, উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট মিল আছে, আবার কতক পার্থক্যও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ যত ব্যবহৃত হয়, লৌকিক ভাষায় তত হয় না। সংস্কৃতমূলক ও দেশজ উভয়বিধ খাঁটি বাঙ্গলা শব্দেরই লৌকিক ভাষায় প্রধান্য আছে। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক শব্দের ও প্রাদেশিক উচ্চারণের ভেদ লৌকিক ভাষায় যতটা বর্ত্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নাই, এবং থাকা উচিতও নহে।

উভয় শ্রেণির শব্দ ভাষায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয় না। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় সাহিত্যের ভাষায় ও সম্ভবতঃ কথাবার্ত্তার ভাষাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, ইহা দুঃখের বিষয়। অনেকে আবার বলিবেন, ইহা সুখের বিষয়। আমিও বলি, ইহা সুখের বিষয়। যাহাই হউক, সে সুখদুঃখের কথা

তুলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক বাঙ্গলায় খাঁটি সংস্কৃতের ব্যবহার বাড়িয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা; ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের এত প্রচলন ছিল না, ইহা সত্য কথা।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ, যাহা এ কালে সম্মার্জ্জনী-সংস্কৃত হইয়া পরিমার্জ্জিত বা অর্দ্ধমার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই তাহার সাক্ষী। সেদিন পরিষৎসভায় কোন সদস্য বলিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইতর সাধারণের জন্য পুস্তক লিখিতেন, পণ্ডিত জনের জন্য লিখিতেন না, সেই জন্যই তাঁহারা অসাধু শব্দের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণটা খুবই সঙ্গত; বস্তুতই চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সাধারণের জন্যই সাধারণের বোধ্য ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন; এমন কি ভারতচন্দ্রেরও সেইরূপ অসাধু প্রবৃত্তি যে একবারেই ছিল না, এমন বলা যায় না। কারণ যাহাই হউক, প্রাচীন সাহিত্যে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচুর প্রয়োগ ছিল, একালের অপেক্ষা বহুলতর প্রয়োগ ছিল। সেই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বর্ত্তমানে অনুকরণীয় না হইতেও পারে; কিন্তু সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই অসাধুভাষাবহুল সাহিত্যের লোপ হউক, এ ইচ্ছা বোধ হয় কেহই করেন না। বরং তাহার উদ্ধার বিধানের জন্যই আজকাল একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষৎ লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও একটু স্পষ্ট বলা ভাল। বাঙ্গলার প্রাচীন লেখকেরা যে পণ্ডিতসেবিত সাধুভাষা ব্যবহার না করিয়া ইতরজনসেবিত ইতরজনবোধ্য অসাধু ভাষার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা যতই পরিতপ্ত হই না কেন, তাঁহাদের রচনা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে কেহই চাহিবেন না। আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত

হইলেও আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না; কিন্তু যদি কেহ চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আমরা তাঁহার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিব।

ফলে আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দের ব্যবহার আছে, সকলই বাঙ্গলা। সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ সঙ্কলন কালে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না।

কেহ হয় ত বলিবেন, কোষগ্রন্থের উদ্দেশ্য ত অর্থ বুঝান। দুর্ব্বোধ্য শব্দই অভিধানে স্থান পাইবে। সুবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে, অর্থাৎ অধিকাংশ খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ, অভিধানে প্রবেশ করাইয়া অভিধানের কলেবর অকারণে ফাঁপাইবার প্রয়োজন কি?

এ প্রশ্নেরও বোধ করি উত্তর আবশ্যক। প্রথমতঃ সকল শব্দ সকলের নিকট সুবোধ্য নহে; আপনার নিকট যাহা সুবোধ্য, আমি তাহা হয় ত বুঝি না। এ স্থলে সকল শব্দের সমাবেশই নিরাপৎ; সঙ্কলনকর্ত্তার বিবেচনার উপর ভার দিলে অনেক শব্দ এড়াইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্কলন কালে এই আপত্তি উঠে না; তখন সরল ও দুরূহ সকল শব্দই নির্ব্বিশেষে গৃহীত হয়। সংস্কৃত কোষকারেরাও সরল সর্ব্বজনবোধ্য শব্দগুলিকে কোষগ্রন্থে স্থান দিতে আপত্তি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, কেবল শব্দের তাৎপর্য্য বোঝানই অভিধানের উদ্দেশ্য নহে। অভিধানে অর্থবিচারের সহিত ব্যুৎপত্তিবিচারেরও প্রথা আছে। যে শব্দের অর্থ সকলেই জানে, সে শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে কিরূপ হইলে, তাহা সকলে না জানিতে পারে। চতুর্থতঃ, অভিধানের আরও একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভাষার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ না করিলে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দরাশির সঙ্কলন আবশ্যক। লোকসংখ্যাকর্ম্মে বা সেনসাস্ ব্যাপারে যেরূপ রাজাধিরাজ হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রেরই একই মূল্য, রাজ-

চক্রবর্ত্তীকেও যেমন একজন লোক বলিয়াই ধরা যায় ও লোকগণনার তালিকায় তিনি তাহার অধিক স্থান পান না, এখানেও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সমান আদর।

কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্য নামে পরিচিত সমস্ত সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই সঙ্কলন আবশ্যক; সকলই বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত। অর্থবিচার ও ব্যুৎপত্তিবিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তালিকাসঙ্কলন অসাধ্য ব্যাপার; তবে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন শব্দকেই বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান।

মাইকেল অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে কেহই তাহার ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ ব্যবহারে সাহসী হন নাই। 'ইরম্মদ' ও 'মহেষ্বাস' শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে অনেককেই স্থিরনেত্র হইতে হইবে। কিন্তু কি করা যাইবে! মাইকেল যখন মেঘনাদবধে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মেঘনাদবধের নাম বাঙ্গলা বহির তালিকা হইতে উঠাইতেও যখন আমরা সম্মত নহি, এবং ভবিষ্যতেও অপর কোন লেখক কর্ত্তৃক ঐ ঐ শব্দের প্রয়োগ নিবারণের জন্য আমরা কোন আইনই খাটাইতে পারিব না, তখন ঐ দুই শব্দকে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত খাঁটি সংস্কৃত শব্দ স্বরূপে বাঙ্গলা অভিধানে স্থান দিতেই হইবে। সেইরূপ প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন লেখক যদি কোন বাঙ্গলা পুস্তকে 'গলদ' ও 'বলদ' ও 'গতর' শব্দের ব্যবহার করিয়া ভাষাকে কলঙ্কিত করিয়াই থাকেন, তাঁহার এই সাধুবিগর্হিত কার্য্য যতই নিন্দনীয় হউক না, ঐ কয়টি গ্রাম্য শব্দকে অভিধানে স্থান না দিলে উপায় নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত না হইলে

বলিতে পারা যাইবে না, যে কোন্ শ্রেণির শব্দের সংখ্যা আমাদের সাহিত্যের ভাষায় অধিক।

ফলে বিশুদ্ধ শব্দ লইয়া এইরূপ কথাকাটাকাটি যুগ ব্যাপিয়া চালান যাইতে পারে। 'বিশুদ্ধ' শব্দটা উভয় পক্ষ এক অর্থে প্রয়োগ করেন না। আপন আপন অর্থে উভয় পক্ষই ঠিক্। বিবাদের হেতু না থাকিলেও বিবাদ চালান যায়। আমি 'বিশুদ্ধ' শব্দটাকেই বর্জ্জন করিয়া 'খাঁটি' শব্দ ব্যবহার করিব। আশা করি 'খাঁটি' শব্দটির অবিশুদ্ধির জন্য পণ্ডিতেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

দাঁড়াইল এই। বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থে দুই শ্রেণির শব্দ থাকিবে,—(১) 'খাঁটি' সংস্কৃত ও (২) 'খাঁটি' বাঙ্গলা। রচনার ভাষায় ও কথার ভাষায় দুই শ্রেণির শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাঙ্গলার সম্পূর্ণ পরিহার একবারে অসাধ্য। খাঁটি সংস্কৃতের পরিহার কতক চলিতে পারে বটে; কিন্তু সেইরূপ পরিহার কর্ত্তব্য বটে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

তার পরের কথা, কোন্ শ্রেণির শব্দ ভাষামধ্যে সংখ্যায় অধিক? বলা কঠিন; বাঙ্গলা ভাষার শব্দসমূহের সংখ্যা নিরূপণে এপর্য্যন্ত কেহ হঠাৎ সাহসী হয়েন নাই। বাঙ্গলার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নাই। যে সকল অভিধান প্রচলিত আছে, তাহা সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত; তাহাতে এমন খাঁটি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ আছে, যাহা আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার,—'বিশুদ্ধ' বাঙ্গলা ভাষার—রচনাতেও ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের যে গুলি নহিলে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা অচল হয়,—বিশুদ্ধ বাঙ্গলা রচনাও অসাধ্য হয়,—তাহাদের অধিকাংশই সেই সকল কোষগ্রন্থে স্থান পায় নাই। এ সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি সাহিত্য-পরিষদের অনেকেরই মনে আছে, সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় একটা পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টায় কোন ফল নাই। যে অংশের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাহা লৌকিক ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে; এবং যে অংশের উদ্দেশ্য শিক্ষিতের জন্য রসসৃষ্টি, অথবা অভিজ্ঞের সহিত জ্ঞানালোচনা, তাহাও লৌকিক ভাষা হইতে দূরবর্ত্তী হইবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কেবল এদেশে কেন; উহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। সকল দেশেই এই প্রভেদ আছে ও থাকাই উচিত ও থাকিবেই। তজ্জন্য বাদানুবাদ বৃথা। লেখকগণও ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি অনুসারে কেহ বা সাহিত্যের ভাষাকে লৌকিক ভাষার অভিমুখে, কেহ বা বিমুখে লইয়া যাইবেন, সে বিষয়েও বাদানুবাদ বৃথা। সকলের ভাষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে না; কখনও হয় নাই ও হওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। তাহা হইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের নাশ হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত রুচিভেদের জন্য কোন নিয়ম বন্ধন চলে না। যাঁহারা নিয়মের বন্ধনে ব্যক্তিগত রুচিকে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই নিস্ফল শ্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত প্রতিভাকে নিয়মরজ্জুতে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই মৃণালতন্তু দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধিতে চাহেন।

সুতরাং এ বিষয়ে নিয়মস্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, উপদেশদান নিরর্থক, ও বাদানুবাদ নিতান্তই নিরর্থক। আপনার রুচি ও আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে, পাঠকের রুচি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কেহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের, কেহ বা বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের, পক্ষপাতী হইবেন, ইহাই নিয়ম। অন্য সঙ্কীর্ণ নিয়ম জারি করিলে তাহা কেহ মানিবে না।

যদি কোন সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা চলে, তাহা এই। ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করিবে, এবং নিতান্ত অকারণে ভাষাকে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য করিবে না।

আর যাহা প্রকৃতই গ্রাম্য অর্থাৎ slang, ভদ্রসমাজ যাহার উচ্চারণে কুণ্ঠিত যাহা প্রকৃতই অসাধু অশিষ্ট ও অশ্লীল, তাহা সর্ব্বতোভবে বর্জ্জন করিবে। এই নিয়মের প্রতি কোন পক্ষেরই আপত্তি হইবে না।

এতটা বাক্যব্যয়ের পর বোধ করি আমি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে এতটা বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেন না, যাহা এতটা পরিশ্রমের পর প্রতিপন্ন করা গেল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য; তাহাতে কাহারও কোন মতভেদ নাই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বাক্যব্যয় একবারে অপ্রাসঙ্গিক। যে মূল বিষয় লইয়া বর্ত্তমান বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই অবান্তর কথাটার প্রসঙ্গমাত্র তুলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কেন না, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণের অভাব দেখিয়া সেই ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। কোন্ ভাষা ভাল, কোন ভাষা মন্দ, সে প্রসঙ্গই তাঁহারা উঠান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অনুকূল, এইরূপ একটু আভাস আছে বটে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত কথা ও অবান্তর কথা। তিনি স্বয়ং খাঁটি বাঙ্গলায় অনুরাগী হইতে পারেন ও অন্য লেখককে সেই পথ অবলম্বনে উপদেশ দিতে পারেন; অন্যে সেই পথ অবলম্বন করিলে তিনি সুখী হইতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহার সহিত অন্যের মত না মিলিতে পারে। কিন্তু এই অবান্তর প্রসঙ্গের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উত্থাপিত মূল প্রসঙ্গকে বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন করা

উচিত নহে। মূল প্রসঙ্গ বাঙ্গলা ব্যাকরণের গঠনপ্রণালী লইয়া; সাহিত্যের ভাষার গঠনপ্রণালী লইয়া নহে।

অন্যতর দ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ ভাষার সৌষ্ঠব-বিচারের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার কোন স্থলে এমন আভাস মাত্র নাই, যাহাতে সংস্কৃতের পক্ষপাতীদের মনে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে। তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন স্থলে বলেন নাই, যে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিবে, বা সংস্কৃত শব্দের প্রতি বিরাগ দেখাইবে। তিনি স্বয়ং রচনাকালে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আধুনিক রচনায়—গদ্য রচনায় ও কবিতা রচনায়—সংস্কৃত-শব্দ-বাহুল্য দেখিয়া হয় ত তাঁহার অনেক বন্ধু ভীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান বিবাদক্ষেত্রে, অর্থাৎ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ও সাহিত্যপরিষৎ সভায়, তাঁহার যে মত এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ মধ্যে বা বক্তৃতা মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কুত্রাপি এমন কোন অনুরোধ নাই, যে তোমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিও না; বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করিও না। তিনি কেবল মাত্র কতিপয় বাঙ্গলা শব্দ,—খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ,—সঙ্কলন করিয়া সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া, ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি লইয়া, আলোচনা করিয়াছেন, ও অপরকে সেইরূপ আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন মাত্র। ঐ সকল শব্দের সকলগুলিই খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ; কতক সংস্কৃতমূলক, কতক বা দেশজ। কতকগুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কতক হয় ত সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই; কতকগুলি হয় ত প্রকৃতই গ্রাম্য অপশব্দ, উহাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিতও নহে। কিন্তু তিনি তাহাদের অর্থ বিচার করিয়াছেন; তাহারা কোথা হইতে

আসিল, কিরূপে সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ কথা বলেন নাই, যে তোমরা সাহিত্যের সাধু ভাষায় এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিও। তাঁহার সকল প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ দুরভিসন্ধির স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চিহ্ন আমি কোথাও পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

স্বীকার্য্য যে রবীন্দ্রনাথ পরিষৎ-পত্রিকাতে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দেরই ব্যাকরণবিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার্য্য যে সেই সকল শব্দের মধ্যে অনেক অসাধু শব্দ রহিয়াছে, অনেক গ্রাম্য শব্দ রহিয়াছে, যাহা সাধু সাহিত্যে আদৃত হয় না ও আদৃত হইবে না। বস্তুতই তন্মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অপভাষা ও গ্রাম্য ভাষা। এই অপভাষার আলোচনাই অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা হয় ত মনে ভাবিয়াছেন, এই সকল শব্দের প্রতি লেখকের একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে ও অনুরাগ আছে; তিনি ব্যাকরণ আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল অপশব্দ সাহিত্যে চালাইতে চাহেন, এবং যদিও সম্প্রতি উহাদের ব্যবহারে সাহসী হন নাই, ভবিষ্যতে কোন্ দিন ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ তিনি যখন মাছের তেলের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তখন কোন্ দিন মাছের তেল মাখিয়াই ফেলিবেন; যখন শেয়ালের জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তখন কোন্ দিন শেয়াল পুষিয়া দরজায় রাখিবেন। লেখকের স্পষ্ট ও তীব্র ভাষা সত্ত্বেও যদি কাহারও এইরূপ আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কা দূর করিবার উপায় নাই। পরিষৎ-সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, যাহা তৎপরে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে, এবং পরিষদে বাদপ্রতিবাদের উত্তরে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর যে ওরূপ সন্দেহ কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা আমার বুদ্ধিতে কুলায় না। অথচ দেখিতেছি, অনেকেরই সন্দেহ

যায় নাই। এখনও অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তর্ক করিতেছেন, সাহিত্যের ভাষায় গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ বাঞ্ছনীয় নহে; যেন রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন। এস্থলে কোন উপায় দেখি না। রবীন্দ্রনাথ বিতণ্ডায় নামিয়া অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহাদের যদি অনুভূতির সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতই উপায় নাই। ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি, আত্মনো যে ন জানন্তি, তাঁহাদের প্রতি বাক্যপ্রয়োগ নিরর্থক।

সাহিত্যে অপভাষার ব্যবহার করিব কি না, এ কথাটাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, কেহ তাহা বলে নাই। কিন্তু অপভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করিব কি না, ইহা প্রাসঙ্গিক বটে। এতক্ষণ পরে যে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার অবসর পাইলাম, ইহাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভারতী পত্রে বলিয়াছেন, এই সকল শব্দগুলির অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত শব্দগুলির অধিকাংশই অতি অকিঞ্চিৎকর; কেন না, সাধু ভাষায় ও সাধু সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার দোষাবহ; কাজেই উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরবর্ত্তী সংখ্যার ভারতীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় নানাভাষাবিৎ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, চলিত ভাষায় ব্যাকরণ রচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না ব্যাকরণ রচনা দ্বারা চলিত ভাষার স্বাধীন গতি ও উন্নতি রুদ্ধ হইতে পারে।

ফলে দুইজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দুই বিভিন্ন হেতুবাদ দর্শাইয়া বলিতেছেন, চলিত বাঙ্গলার অর্থাৎ লৌকিক বাঙ্গলার ব্যাকরণ আলোচনা আবশ্যক নহে। রবি বাবু যেদিন পরিষৎসভায় কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেদিন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকটা আভাসে বলিয়াছিলেন যে এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনার এখনও

সময় আসে নাই। ইহাকে একটা তৃতীয় হেতুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ হেতুবাদের আলোচনা আবশ্যক।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কেন না ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, সেইটা নির্দ্ধারিত হইলে বিচারের পথ অনেকটা সোজা হইতে পারে। ব্যাকরণ শব্দের অর্থেও একটু গোল আছে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ পদের বিশ্লেষণ; ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রত্যেক পদকে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখাইতে চাহেন, কিরূপে কোন্ মূল ধাতু হইতে পদটি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উহার উপাদানগুলি কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়া উহার শরীরটি গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখানই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। ইংরেজিতে যাহাকে Etymology বলে, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। কিন্তু আজকাল ব্যাকরণ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়; উহা ইংরেজি গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; তন্মধ্যে Etymology ব্যতীত Syntax বা বাক্য নির্ম্মাণ প্রকরণ, ছন্দঃপ্রকরণ, এমন কি অলঙ্কার প্রকরণ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে। আমরা ব্যাকরণ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিলাম। তাহাতে বক্তব্যের কোন ক্ষতি হইবে না।

মনুষ্যের ভাষা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, ভাষার গঠন-প্রণালীতে কতকগুলি নিয়ম আছে। শব্দের গঠনে, পদের গঠনে ও বাক্যের গঠনে এইরূপ নিয়মের আবিষ্কারই ব্যাকরণের (অর্থাৎ গ্রামারের) উদ্দেশ্য। এইরূপ নিয়ম যে ভাষামাত্রেই বর্ত্তমান, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কোন নিয়ম না থাকার নাম সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা; এবং যে ভাষা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, কোন নিয়মই যাহা মানে না, তাহা মনুষ্যের ব্যবহার্য্য নহে। অতি অসভ্য জাতির ভাষাকেও বিশ্লেষণ করিলে সেই ভাষার অবস্থানুরূপ নিয়মের আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অসভ্য জাতির ভাষারও ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে। যে ভাষায় নিয়ম আদৌ নাই, সে ভাষা কেহ শিখিতে পারে না, কাহাকেও শিখান যায় না; তাহা ভাষাই নহে। কোন নিয়ম থাকিলেই সেই নিয়মের আবিষ্কার যিনি করিবেন, তিনিই সেই ভাষার বৈয়াকরণিক।

ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটি বিজ্ঞান শাস্ত্র; ব্যাপক অর্থে ইহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশ বোধ করি সর্ব্বপ্রধান অংশ, যাহা Etymology অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাকরণ, তাহা আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে পরা কাষ্ঠা পাইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনির হস্তে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনিই জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক; তাঁহার তুল্য আর কেহ জন্মায় নাই। মেকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে একলিপস্ সকলের অগ্রণী; অন্যের স্থান বহু দূরে। পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতে আচার্য্যেরা ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংস্কৃত-ভাষাবিজ্ঞান গঠিত করিতেছিলেন; পাণিনি সেই বিজ্ঞানকে প্রায় সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা দান করেন। তার পর যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা তাহারই বার্ত্তিক ও ভাষ্য ও টীকা। আধুনিক বৈয়াকরণেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সেই প্রাচীনকালের ভাষা বিজ্ঞানের বালকপাঠ্য পুস্তক মাত্র।

পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যেরা ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার পক্ষে প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান; তাহাই প্রকৃত ব্যাকরণ। আমরা বালকগণকে ও অনভিজ্ঞকে ভাষা শিখাইবার জন্য যে সকল ব্যাকরণ-ঘটিত পুস্তক লিখি, তাহা বৈজ্ঞানিক পুস্তক বটে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস ব্যাকরণকারেরা যে নিয়ম বাঁধেন, ভাষা সেই নিয়মে চলে। মিথ্যা কথা। কোনও

ব্যাকরণকারের সাধ্য নহে যে কোন নিয়ম বাঁধেন, কোন আইন জারি করেন। ভাষার নিয়ম ব্যাকরণকারের বৃদ্ধপিতামহগণের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে; তিনি সেইগুলি আবিষ্কার করিয়া অন্যকে দেখাইয়া দেন মাত্র। নিয়ম বাঁধার কথা উঠিতেই পারে না।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোনখানিও প্রকৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাঙ্গালা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই, কোন্ ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও কেহ জানে না। উহা সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত, একথার এই অর্থ, যে উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে; উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা অনুবাদ।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল বালকপাঠ্য ব্যাকরণ লইয়াই যেন ব্যাকুল। যেন ব্যাকরণ শাস্ত্র বালক ভিন্ন বৃদ্ধের জন্য আবশ্যক নহে। প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা; ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে হইবে; তাহার পর উহা অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাঙ্গলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেন না, বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না আছে, তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই। সে সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখন বর্ত্তমানই নাই। বাঙ্গলার ব্যাকরণ কি পদার্থ তাহা কেহই জানেন না; রবীন্দ্রনাথও জানেন না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রও

জানেন না। কেহই যখন জানেন না, তখন অন্তকে শিখাইবেন কি? কাজেই পরকে শিখাইবার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গ এখন উঠিতেই পারে না। এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যাহা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, উহা সেই অংশের ব্যাকরণ। সেই ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না; সেকালের আচার্য্যেরা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি শিখিতে চাই, তাঁহাদের পুঁথি পড়িলেই হইবে; অন্যে যদি শিখিতে চায়, সেইখানে বরাত দিলেই হইবে। বালকেরা যদি শিখিতে চায়, তাহাদিগকে মূল সংস্কৃত হইতে অথবা তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ হইতে শিখাইলেই চলিবে। বালকদিগকে উহা পড়াইও না, এ কথা কেহ বলে না। কিছু পড়াইতেই হইবে; কেন না, বাঙ্গলা যখন সংস্কৃতের সম্পত্তির কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেই অংশটুকু বুঝাইবার জন্য পড়াইতে হইবে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনার পরিশ্রমে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য; পরিষৎ যদি তাহার কিঞ্চিৎ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন, পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।

এই কথাটা অত্যন্ত সহজ; অথচ কি কারণে ইহা পণ্ডিতগণের মাথায় আসিতেছে না, তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অন্যের তাহাতে রুচিগত আপত্তি থাকিতে পারে; অমার সে আপত্তি নাই। অন্যের মতে সীতার বনবাসের ভাষা উৎকৃষ্ট ভাষা না হইতে পারে; আমার

মতে উহা উৎকৃষ্ট ভাষা। এই উৎকৃষ্ট ভাষা সংস্কৃতবহুল; ইহা বুঝিতে হইলে ও বুঝাইতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করি। যাঁহারা এই ভাষা পছন্দ করেন না, যাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করিবেন না, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার ধারিতে না চাহিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম ও সমাসের নিয়ম ও পদ সাধিবার নিয়ম শিখিতেই হইবে। তাঁহারা শিখুন, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণসমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হউন, কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহারা গ্রীক লাটিনের ব্যাকরণ শিখিতে গেলে ত কেহ আপত্তি করে না; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে গেলেই বা কে বাদী হইবে? বিদ্যালয়ের বালকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা দিগকে যতটা শেখান দরকার বোধ কর, শেখাও; তাহাতেই বা আপত্তি কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তজ্জন্য ব্যাকুল হইবার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন আছে। সীতার বনবাসেও খাঁটি বাঙ্গলা পদের বহু প্রয়োগ আছে। সেই সকল পদ কোথা হইতে আসিল, সেই সকল পদ কি নিয়মের অনুসারে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেহই জানে না। সেইগুলির আলোচনা সাহিত্য-পরিষদেরই কাজ। সাহিত্য-পরিষৎ সেই আলোচনার যোগ্য পাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে; সাহিত্য-পরিষৎ তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহেন। বাঙ্গলা ব্যাকরণ নাই; সাহিত্য-পরিষৎকে তাহা গড়িতে হইবে।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে; কালে আরও হইবে; হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। সীতার বনবাসে প্রথম বাক্য—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন

করিতে লাগিলেন,"—ইহা বাঙ্গলা বাক্য, সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গলা বাক্য। কেহ বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই উহা অপকৃষ্ট বাঙ্গলা; আমি বলিব, তথাস্তু। কেহ বা বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা; আমি বলিব, তথাস্তু। উৎকৃষ্টই হউক বা অপকৃষ্টই হউক, উহা বাঙ্গলা। উহার মধ্যে কতক পদ খাঁটি বাঙ্গলা; কতক খাঁটি সংস্কৃত; কিন্তু বাঙ্গলা বাক্যরচনার নিয়মানুসারে ঐরূপ দ্বিবিধ পদ একত্র গাঁথিয়া বাক্যটি রচিত হইয়াছে। ঐ বাক্যটি ইংরেজি নহে, ফারসী বা আরবী নহে, সংস্কৃতও নহে, প্রাচীন প্রাকৃতও নহে; উহা বাঙ্গলা। এই বাক্যটির অন্তর্গত সমুদয় পদের ব্যাকরণ অর্থাৎ ইটিমলোজি না জানিলে এই বাক্যের ভাষাগত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। এইজন্য তদন্তর্গত সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। প্র তি ষ্ঠি ত পদের ব্যুৎপত্তি প্র তি + স্থা + ত; উহা না জানিলে প্র তি ষ্ঠি ত পদটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কেন উহার অর্থ ঐরূপ হইল, তাহা বুঝা যাইবে না। প্র তি ষ্ঠি ত পদটিকে তজ্জন্য ভাঙ্গিয়া উহার ধাতুপ্রত্যয় বাহির করা আবশ্যক। এইরূপে বিশ্লেষণ কার্য্য সমাধানের পর ঐ পদটির অর্থ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের আচার্য্যেরা এই বিশ্লেষণ কর্ম্মের সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা কিছুই রাখেন নাই। আমাদের তজ্জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নের কোন অবকাশ নাই। কোন সংস্কৃত ব্যাকরণের পাতা উলটাইলেই দেখিতে পাইবে যে প্র তি ষ্ঠি ত শব্দের ব্যুৎপত্তি কি। বাঙ্গলা ভাষা এই শব্দটি সংস্কৃতের নিকট গ্রহণ করিয়াছে; যাঁহারা বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারাও সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া আপন গ্রন্থ মধ্যে বসাইয়া দেন ও তাহার নাম দেন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ। কিন্তু উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

এইরূপ অনুবাদকারের সবিশেষ কৃতিত্ব নাই; সবিশেষ অপরাধ আছে, তাহাও বলিব না। তবে যদি তাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহা হইলে অবজ্ঞাই তাহার পুরস্কার। যে সকল ছাত্রকে সীতার বনবাস পড়িতে হয়, অথচ যাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানে না, তাহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিলে সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি তাহারা বুঝিতে পারিবে। এই কারণে এই সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থের উপকারিতা আছে।

এইরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব ও অপত্যনির্ব্বিশেষ শব্দ দুইটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে বহুদিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা কিরূপ দর্পের সহিত পঞ্চাশটা শব্দকে একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া একটা পদ নির্ম্মাণ করে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে তন্ন তন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। উহা ছাত্রগণকে তর্জ্জমা করিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি দেখি না। সুতরাং শিশুবোধের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদ অনুবাদ করিয়া দিলে গর্হিত কাজ হয় না।

কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অংশের বাঙ্গলায় প্রয়োগ হয় না, বাঙ্গলা ব্যাকরণে তাহারও যেন অনুবাদ করা না হয়। তাহা হইলে বালকদের মতিভ্রম জন্মাইতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

কিন্তু সীতার বনবাসের ঐ বাক্যমধ্যে সংস্কৃত পদগুলি ছাড়া কয়েকটি বাঙ্গলা পদ আছে; যথা হইয়া এবং করিতে লাগিলেন। এই কয়টি পদ না থাকিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইত না। বরং সংস্কৃত পদগুলির স্থানে খাঁটি বাঙ্গলা পদ বসাইলে উৎকৃষ্ট না হউক, চলনসই বাঙ্গলা হইতে পারিত; কিন্তু এই খাঁটি বাঙ্গলা পদগুলির স্থান লইতে পারে, এমন কোন সংস্কৃত পদই নাই। ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে বাক্যটা বাঙ্গলাই হইত না। এই পদগুলির সন্নিবেশই বাঙ্গলার বিশিষ্টতা।

কিন্তু এই পদগুলি কিরূপে সাধিতে হইবে, তাহা কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থে নাই। কেন না, এই পদগুলি সংস্কৃতমূলক হইলেও সংস্কৃত নহে। ইহারা খাঁটি বাঙ্গলার নিজস্ব। ইহাদিগের উপর অন্য কোন ভাষার কোন স্বত্ব নাই। ইহাদিগের গঠনপ্রণালীর বিচার যে শাস্ত্রে করিবে, তাহাই বাঙ্গলা ব্যাকরণ। কিন্তু সেই বাঙ্গলা ব্যাকরণ এখন কোথায়?

প্রচলিত শিশুপাঠ্য বাঙ্গলা ব্যাকরণগুলি খুলিয়া দেখিলে ঐ শ্রেণির পদের ব্যুৎপত্তির কোন তথ্য পাওয়া যাইবে না। কোন ব্যাকরণকার যদি বাঙ্গলা শব্দের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উহাদিগকে সাধিবার কোন চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, জানি না। কেন না এই পদকয়টির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বাঙ্গলা দেশের সপ্তকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেহ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি না।

যদি বলেন, ঐ সকল শব্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, উহাদিগকে লইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধিত হয় না, তাহা হইলে অবশ্য নিরুত্তর হইতে হইবে। উহারাই বাঙ্গলা ভাষার দেহ গড়িয়াছে; উহাদিগকে বর্জ্জন করিলে বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলা হইবে না।

হ ই য়া পদ সংস্কৃত ভূ ত্বা পদ হইতে আসিয়া থাকিবে; খুব সম্ভবই তাহাই। কিন্তু এই পরিণতি কখনই সহসা সাধিত হয় নাই। ভূ ত্বা পদ নানা রূপপরিবর্ত্তের পর অবশেষে হ ই য়া তে দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল মধ্যবর্ত্তী রূপ কি? কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণে তাহার উত্তর নাই; অথচ তাহার উত্তর দেওয়াই বাঙ্গলা ব্যাকরণের কার্য্য। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে যে ভাষার সাহায্য লইতে হয়, লও। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যেখানে যাহা বর্ত্তমান আছে, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ। বঙ্গদেশের দূর দূরান্তের প্রাদেশিক ভাষায় কোন্ কোন্

রূপ বর্ত্তমান আছে, খুঁজিয়া দেখ। তাহার পর উত্তর দিবার চেষ্টা করিও। তৎপূর্ব্বে একটা আনুমানিক উত্তর দিলে তাহা গ্রহণ করিব না;—কিছুতেই না। হর্ণলী সাহেব বলিয়াছেন কর্ত্তব্য হইতে করিব উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, করিষ্যামি হইতে করিব হইয়াছে। করিষ্যামি' কিরূপে করিব' তে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের জন্য সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা আবশ্যক; প্রাদেশিক ভাষা সমস্ত খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক। সহজে প্রমাণ হইবে না। অর্থসাদৃশ্য প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে। সে প্রমাণ কোথায়?

হইয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সমর্থ হইলে তখন যাইয়া করিয়া খাইয়া প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে। তখন বাঙ্গলা ব্যাকরণের একটা সূত্র আবিষ্কৃত হইবে। সেই সূত্র একটা নবাবিষ্কৃত তথ্য; এইরূপ তথ্যসমষ্টি লইয়া নূতন বাঙ্গলা ব্যাকরণের দেহ রচিত হইবে। সে বহু দূরের কথা; এখন মজুরি কর।

বাঙ্গলা ভাষার সমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক ঝিনুক কঙ্কাল কঙ্কর মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আন। কাহাকেও বর্জ্জন করিও না; কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। কি জানি, কোন্ অবজ্ঞাত জঞ্জাল হইতে কি নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে! কি জানি কোন্ অগ্রাহ্য কঙ্কর মাজিয়া ঘষিয়া দেখিলে কোন্ রত্নে পরিণত হইবে! ডুবুরির মত যাহা পাও, কুড়াইয়া আন। সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত কর। জহুরি কোন্ উপলখণ্ড হইতে কি জহর বাহির করিবেন, কে জানে? যত দিন বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, তত দিন জাতীয় মিউজিয়মে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে পার, উত্তম; তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের

সহায় হইবে। সাজাইতে না পার, রাখিয়া দাও। কিন্তু অবহেলা করিও না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্য ভাষা' বলিয়া অবজ্ঞায় অধিকার তোমার নাই।

আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত নিয়ম বর্ত্তমান আছে; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সকল ভাষাতেই নিয়ম আছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, লাটিনে, গ্রীকে, ধাঙ্গড়ের ভাষায় ও সাঁওতালের ভাষায়, সর্ব্বত্র নিয়ম আছে। কেন না, নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না। নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতে আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা অনেকটা বন্ধনশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা নিয়মবর্জ্জিত? অসম্ভব। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষার মধ্যেও নিয়ম আছে। অন্বেষণ কর, বাহির হইবে।

ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না; উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র। ব্যাকরণ ভাষার উন্নতির প্রতিরোধ কিরূপে করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত হইবে; ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে; তাহাতে ভয় কি?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও ত তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি প্রাচীন বসুন্ধরার মূর্ত্তি যুগ ব্যাপিয়া বিকৃত হইতেছে। এই বিকৃতির নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কার্য্য, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। কোটি বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে সময়ে পার্থিব ঘটনা যে যে নিয়মে সঙ্ঘটিত হইত, এখন সে সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্য্যের তাপ মন্দ হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন

চন্দ্রের আকর্ষণ মন্দ হইবে, তখন আর ঠিক বর্ত্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্ত্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিণতির রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকারের রোধ করিতে পারেন নাই।

নিয়ম বাঁধা যখন ব্যাকরণকারের উদ্দেশ্য নহে, নিয়ম আবিষ্কারই তাঁহার যখন উদ্দেশ্য, তখন এ আপত্তি টিকিতেই পারে না। বাঙ্গলা ভাষাতে যদি নিয়ম থাকে, সেই নিয়মগুলি জানা আবশ্যক। কেবল সাহিত্যের ভাষা কেন, লৌকিক ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষাও অনিয়ত নহে। ঐ সকল ভাষারও ব্যাকরণ আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের ভাষা যত সুশৃঙ্খল ও যত সুনিয়ত, লৌকিক ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা ততটা সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ত নহে; উহার ব্যাকরণও তদনুরূপ হইবে। হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? ভাষাবিজ্ঞান যদি আলোচ্য হয়, তবে ভাষার কোন অবস্থাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

ভাষাবিজ্ঞানের Etymology অংশ লইয়া এত কথা বলা গেল। Syntax অংশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গলা ভাষার বাক্যরচনা রীতি সংস্কৃত বাক্যরচনা রীতির সহিত সর্ব্বাংশে সমান নহে। কাজেই বাঙ্গলা ব্যাকরণের এই অংশেও সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত পার্থক্য থাকিবেই। সাদৃশ্যও থাকিবে, পার্থক্যও থাকিবে। বাঙ্গলা ব্যাকরণে সেই সাদৃশ্য ও সেই পার্থক্য উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। নতুবা ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গলা ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক

আছে; কিন্তু ইহা তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা নহে। বহুকোটি মনুষ্যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহে; বহুশত লোকে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে। কিন্তু ইহাদের সকলে সংস্কৃত বুঝে না। সংস্কৃত ভাষা ইহাদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা ইহারা মাতৃস্তন্য পানের সহকারে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিখিয়া থাকে। অন্য ভাষাতে যেমন নিয়ম আছে, বাঙ্গলা ভাষাতেও সেইরূপ নিয়ম আছে। নিয়ম না থাকিলে ইহা মনুষ্যের ভাষা হইত না; মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিত না।

কিন্তু সেই সকল নিয়মের এখনও কেহ আলোচনা করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সেই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধীজনকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।

বালকগণের জন্য বাঙ্গলা ব্যাকরণরচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এখনও গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম সকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। এই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে, তখন বাঙ্গলার পাণিনি নিজ প্রতিভাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবিষ্কারসকলের সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবেন। তার পরে সেই ব্যাকরণ বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইবে। সেই পাণিনির জন্মে এখনও অনেক বিলম্ব। এখনও তাঁহার জন্মের সময় হয় নাই। আমাদিগকে তাঁহার আবির্ভাবের জন্য আয়োজন করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে বহুদিনে যদি সোপান গড়িয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন সেই সোপানের দ্বারা উচ্চে আরোহণ করিবেন। অথবা তিনি যে মন্দির গড়িবেন,

আমাদিগকে তাহার জন্য খড় খুঁটি চুণ কাঠ ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি কাহারও সাধ্য থাকে, অট্টালিকার নক্‌সাটাও তৈয়ার করিয়া রাখিবেন; কাহারও সাধ্য থাকে, দুই একটা ভিত্তিপত্তন করিয়া রাখিবেন মাত্র।

মাণ্যবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ। ব্যাকরণশাস্ত্র নির্ম্মাণের এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু উপাদান সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ এখনই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না; সাহিত্যপরিষদের কোন বর্ত্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নক্‌সাটা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার কোন ভগ্নাংশ গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। উপাদান সংগ্রহ সাহিত্যপরিষদের সাধ্য। কেন না, উপাদান সংগ্রহ মজুরের কাজ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে যে বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি ব্যাকবণ রচনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং এই মজুরের কাজে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্ম্মকে হেয় কার্য্য জ্ঞান করেন, সেই আশঙ্কায় স্বয়ং মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনিস্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই; তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার কোন ক্ষুদ্র অংশের নক্‌সার আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার না দিলে চলিবে কেন?

সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিদ্বয়ের উদ্দেশ্য আমি এইরূপ বুঝিয়াছি; এবং পরিষদের সম্পাদক স্বরূপে উপাদান সংগ্রহের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছি। ইন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যথোচিত উপাদানসংগ্রহ না হইলে ব্যাকরণ রচিত হইবে না। সেই উপাদানসংগ্রহই পরিষৎ-পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি। যতদিন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি পরিষদের অনুগ্রহভার বহনে বাধ্য থাকিবে, ততদিন ইহাই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু এই যে বাঙ্গলা ব্যাকরণ, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বহীন, এবং যাহা ভবিষ্যতে রচিত হইবে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হইবে কি না? এই প্রশ্ন লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। অথচ ইহার অধিকাংশই বাগ্‌জালমাত্র।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের আদর্শে রচিত হইবে কি না, এ প্রশ্নে এত গণ্ডগোল কেন হয়, বুঝিলাম না। এক অর্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ কেবল বাঙ্গলায় কেন, সকল ভাষাতেই গ্রহণ করা চলিতে পারে। বস্তুতঃ ভাষাবিজ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের হাতে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও করে নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের অবস্থা উন্নত ছিল না। সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাবিজ্ঞান কিরূপে অনুশীলন করিতে হয়, তাহা শিখিয়াছেন। তৎপরে বিবিধ ভাষার তুলনায় আলোচনা দ্বারা ভাষাবিজ্ঞান তাঁহাদের হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তখন বাঙ্গলা ব্যাকরণে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু এই আদর্শ হইবে প্রণালীগত আদর্শ। বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই একরূপ। ভাষাবিজ্ঞানেও যে পদ্ধতি, প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে ও

জীববিজ্ঞানে, সর্ব্বত্রই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নহে; জ্যোতিষও রসায়ন নহে। সেইরূপ নানা ভাষার অলোচনাতে একই আদর্শ গৃহীত হইলেও সেই নানা ভাষা এক হইয়া যায় না।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের রচনাতেও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ অবলম্বিত হউক, ইহা প্রার্থনা করি। এমন উৎকৃষ্ট আদর্শ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সামান্য বা সাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই সামান্যের আবিষ্কার করিতে হইবে। আবার উভয় ভাষায় প্রকৃতিগত বৈষম্যও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই বৈষম্যের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। সম্পূর্ণ ব্যাকরণে এই সামান্য ও বৈষম্য উভয় পক্ষেরই যথাযথ অলোচনা থাকিবে। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি তর্জ্জমা করিয়া দিলে উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইবে না।

বর্ত্তমান শিশুপাঠ্য বাঙ্গলা ব্যাকরণে এই সকল বৈষম্য দেখাইবার চেষ্টা যে একবারে হয় না, এমন নহে। কিন্তু সে চেষ্টার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যে পরিমাণ পরিশ্রমের ও চিন্তার পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কখনও কেহ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ সেই চেষ্টার জন্য সুধীগণকে আহ্বান করিতেছেন। সুধীগণ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া কার্য্যের গৌরবানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই প্রার্থনা করি। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহাদের কার্য্য; বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনর্থক বাদবিসংবাদে সময়নাশের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেই বিবাদে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা অবান্তর কথা আসিয়াছে, সেটারও একটু আলোচনা আবশুক। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল শব্দ ব্যবহার কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কি না? এ প্রশ্নও যে কেন উঠে, তাহা জানি না। অথচ ইহা উঠিয়াছে। এক দল পণ্ডিত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝি বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচার অবলম্বিত হয়। কিন্তু হরপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথ কোন স্থানে এরূপ কোন কথা বলিয়াছেন কি, যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিব না? আমি ত কোথাও সেরূপ উক্তি দেখি নাই। এই আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু আশঙ্কার অবশ্য একটা ভিত্তি আছে। আজ কাল অনেকে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ কালে ব্যাকরণ ভুল করিয়া ফেলেন। কেবল যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকেই ভুল করেন এমন নহে; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেও ভুল করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতার ফল অথবা অনবধানের ফল। 'কেশ-বিনাশিনী তৈল' অথবা 'কৃতান্তাকর্ষণী মহৌষধ' কেবল যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই দেখা যায়, এমন নহে; একালের সাহিত্যেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে সকল লেখক অনবধান বা অনভিজ্ঞতা বশে এইরূপ ব্যাকরণ ভুল করেন, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শাস্তি দাও। তাঁহাদিগকে ছেদন ভেদন কৃন্তন কর; তাঁহাদিগকে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া ফেল; অথবা তাঁহাদের জন্য ডালকুত্তার ব্যবস্থা কর। কেহ আপত্তি করিবে না। এই অধম লেখক আপত্তি করিবে না। রবীন্দ্রনাথ ও শাস্ত্রী মহাশয়ও আপত্তি করিবেন না। কেন না, ইহা অতি সহজ কথা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আমাদের গবেষণা নিরর্থক। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গলা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য।

বোধ হয় এ বিষয়েও মতদ্বৈধ বর্ত্তমান নাই। বিবাদ উঠে প্রয়োগের বেলায়। দু একটা দৃষ্টান্ত লইব। অপ্সরাগণ লিখিব কি অপ্সরোগণ লিখিব? সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অপ্সরাগণ ভুল হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থানবিশেষে, যেখানে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সমাসঘটালঙ্কৃত পদাবলির ব্যবহার হইতেছে, সেখানে অপ্সরোগণ লিখিতেই হইবে। কিন্তু অপ্সরা একটি বাঙ্গলা শব্দ; উহা সংস্কৃতমূলক; সংস্কৃত অপ্সরস্ শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গলা আকারান্ত অপ্সরা এবং ঈকারান্ত অপ্সরী শব্দ বহু দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত চক্ষুস্ ধনুস্ প্রভৃতি সকারান্ত শব্দের অন্ত্য বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গলায় উকারান্ত চক্ষু, ধনু প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 'চক্ষুষ্মান্' 'ধনুর্ব্বাণ' প্রভৃতি স্থলে খাঁটি সংস্কৃতের অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু 'চক্ষু দ্বারা' 'ধনু ধরিয়া' প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা শব্দেরই ব্যবহার আছে। সাহিত্যের ভাষায় দুই রকম প্রয়োগই চলিতে পারে। সেইরূপ, অপ্সরা এই বাঙ্গলা শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক। সংস্কৃত নিয়মানুসারে অপ্সরাগণ হয় না; কিন্তু বাঙ্গলার নিয়মে হয়। মনে হইতেছে, ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরা-গণের বাস'। তিনি বাঙ্গলা প্রয়োগ বিধির অনুসরণ করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালই করিয়াছেন; অপ্সরোগণ এখানে ভাল শুনাইত না। বাঙ্গলায় যখন অপ্সরা শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তখন বাঙ্গলা সমাসেই বা আপত্তি কি?

'সৃজন' ও 'সর্জ্জন' একটা পুরাতন আপত্তির ক্ষেত্র। সর্জ্জন শব্দ ব্যাকরণসঙ্গত সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু উহা বাঙ্গলায় এপর্য্যন্ত চলে নাই। বিসর্জ্জন চলিয়াছে, সর্জ্জন চলে নাই; চলা হয়ত প্রার্থনীয়ও নহে। সংস্কৃত শব্দ এমন অনেক আছে, যাহা বাঙ্গালায় চলে নাই;

জোর করিয়া চালাইলেও সাধারণে গ্রহণ করিবে না। মাইকেল তাহার প্রমাণ। শুনিতে পাই 'সৃজন' শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে। তথাপি উহা বাঙ্গলা শব্দ; উহা বহুকাল হইতে প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ; বৈষ্ণব লেখকেরা না কি উহা চালাইয়া গিয়াছেন। মৎস্য স্থলে মাছ লিখিলে যদি ভুল না হয়, তৈল স্থলে তেল লিখিলে যদি ভুল না হয়, সর্জ্জন স্থলে বহু কালের প্রচলিত সৃজন লিখিলেই বা ভুল হইবে কেন? তবে সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি সৃষ্টি লিখুন; অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্জ্জন লিখিবেন না।

কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাদানুবাদে কোন ফল নাই। মূল বিষয়টা ইহাতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। বাঙ্গলা নামে একটা ভাষা আছে। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। কেহ বা বলেন, কোন অনার্য্য ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিচ্ছদ পরিয়া, সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, বাঙ্গলা রূপ ধারণ করিয়াছে। হয় ত এ সিদ্ধান্তের সম্যক্ ভিত্তি নাই, হয় ত ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, বিনা অনুসন্ধানে তাহা মিলিবে না। বিনা পরিশ্রমে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। ঘরে বসিয়া কাগজ কলমের সাহায্যে ইহার উত্তর মিলিবে না। আনুমানিক উত্তর অগ্রাহ্য।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বাঙ্গলা ভাষাকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া, দেখিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন শবদেহ ছিন্ন করেন, সেইরূপে ভাষার দেহ ছিন্ন করিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন অণুবীক্ষণ যোগে প্রত্যেক কোষকে পরীক্ষা করেন, সেইরূপ যুক্তির অণুবীক্ষণ যোগে প্রত্যেক শব্দকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন শব্দকে অবহেলা করিলে

চলিবে না। শরীরতত্ত্ববিৎ কোন অঙ্গ পরিহার করেন না। সেই রূপ এ শব্দটা slang, এটা প্রাদেশিক, এটা অকিঞ্চিৎকর, এই বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বলে না। তত্ত্বান্বেষীর নিকট কিছুই অবহেলার বিষয় নহে; কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। ধুলিকণায় যে তত্ত্ব নিহিত আছে, সৌরজগতের তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর না হইতেও পারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী, প্রভৃতির সহিত বাঙ্গলার তুলনা করিতে হইবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা সমুদয় পরস্পর তুলনা করিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের প্রচলন পরীক্ষা করিতে হইবে। ধাঙ্গড়ের ভাষা, সাঁওতালের ভাষা, কোল দ্রাবিড় ভুটিয়ার ভাষা খুঁজিতে হইবে; কে বলিতে পারে, ঐ সকল ভাষার সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ কি; কে জানে উহাদের কাছে বাঙ্গলার কতটা ঋণ আছে।

কার্য্য অতি বৃহৎ। দশ জনের বা দশ বৎসরের চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইবে না। কোনও দেশে হয় নাই; কোনও কালে হয় নাই। বিজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

আমার মনের ভাব তোমাকে জানাইবার জন্য ভাষা; এই উদ্দেশ্য যত সহজে, যত অল্প শ্রমে ও যত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ততই ভাষার সার্থকতা।

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধটা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট কি না, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ স্থলে শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ মানুষেরই কল্পিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শব্দ একটা সঙ্কেতমাত্র। পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কেতটা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই জীবনযাত্রা চলিয়া যায় ও ভাষার উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

মানুষের মনে যত কিছু ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের জন্য এক একটি পৃথক্ সঙ্কেত থাকিলে বোধ করি ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাষা বলা যাইতে পারিত। আমাদের মনে ভাবের সংখ্যার সীমা নাই, কিন্তু আমাদের শব্দসঙ্কলনশক্তি সঙ্কীর্ণ। ফলে কয়েকটি মাত্র শব্দ বা সঙ্কেত লইয়া অসংখ্য মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়। এইখানে ভাষার প্রধান অপূর্ণতা। কিন্তু এই অপূর্ণতা পরিহারের উপায় দেখা যায় না।

এই দোষ কথঞ্চিৎ পরিহারের জন্য নানাবিধ কৌশল প্রযুক্ত হয়। পাঁচটা ভাব একজাতীয় হইলে আমরা একটা শব্দকেই উপসর্গ প্রত্যয়াদি যোগে নানা উপায়ে গড়িয়া পিটিয়া নানাবিধ আকার দিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতেও কুলায় না।

অগত্যা বাধ্য হইয়া একটা শব্দ কখন কখন পাঁচটা অর্থে ব্যবহার

করিতে হয়। ইহা ভাষার নির্দ্ধনতাসূচক। আবার একই অর্থে কখন কখন পাঁচটা শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা নির্দ্ধনের ধনবত্তার আড়ম্বর। এই আড়ম্বর না থাকিলে ভাষার সৌষ্ঠবার্থ বসন ভূষণ প্রভৃতির একটু হানি হইত, কিন্তু তাহার অস্থিমজ্জা মাংসপেশী সবল ও সমর্থ হইত।

তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূমিকর্ষণ করিতে গিয়া কৃষিযন্ত্রের সৌষ্ঠব অপেক্ষা কার্য্যকারিতার উপর অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে মাটি খুব দড়, সেখানে এমন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত মাটিতে চাষ চলে। যখন শুষ্ক নিরেট জ্ঞানের আলোচনা লক্ষ্য করিতে হইবে, তখন ভাষার পূর্ণতার দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হয়।

বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দ্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, তাৎপর্য্য থাকে। প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মুল সূত্র। এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা প্রণয়ন করিলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়। উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র মনে রাখিয়া পরিভাষা-প্রণয়নে প্রবৃত্ত না হইলে উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, তত্ত্বপ্রচার ও সত্যপ্রচার যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদিগকে বিষয়ের গৌরববোধে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতির সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির

বহুশ্রমাহৃত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে অপরের সমাহৃত এই অতুল সম্পত্তি আমাদের নিজস্ব করিয়া লইতে পারি। ইহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিরোধ বা বৈরিতা নাই। এক্ষণে যদি আমরা অলস হইয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্‌মুখ হই, তাহাতে যে ক্ষতি, যে লজ্জা, যে পাপ হইবে, আমাদিগকেই তাহার ফলভাগী হইতে হইবে। আমরা যদি আমাদের গৌরব রাখিতে চাই, তবে আমাদের প্রাচীন কালে শিষ্য যেরূপ বিনয়ের সহিত অবনতশিরে গুরুসমীপে উপস্থিত হইত, সেইরূপ বিনয়ের সহিত শিক্ষার্থিরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্ম্মিত বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কিন্তু এই জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিদেশীয় ভাষা প্রধান অন্তরায়স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ফরাসী হয় ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা কালে বিশ্বজগৎকর্তৃক গৃহীত হইবে; ইংরেজ হয়ত আশা করেন, তাঁহায় ভাষা বিশ্বভাষা হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু সম্প্রতি সে আশা সুদূরপরাহত। শুনা যায়, অনেকে সার্ব্বভৌমিক ভাষা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন; কিন্তু এখনও সে দিন আসিতে বিলম্ব আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে বিজাতীয় অনাত্মীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না; কখনও আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কৃত মার্জ্জিত পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই

মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তার কর্ম্মের ও জ্ঞানপ্রচার কর্ম্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, তাহাকে পুষ্ট সমর্থ পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদন এখন কৃতী বাঙ্গালীর অন্যতম কার্য্য।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণয়ন কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ভরসা করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে। গ্রন্থকারগণ ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদে যতদূর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সকলে ততদূর সাবধান হয়েন না। গ্রন্থকারগণের দোষ দেওয়াও সর্ব্বত্র সমীচীন নহে; কার্য্যটি প্রকৃতপক্ষে বড়ই দুরূহ।

সম্প্রতি পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক পরিভাষানির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদও বঙ্গসাহিত্যের গতিপথনির্দ্দেশে উদ্যোগী হইয়া ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং এই সময়ে এই সম্পর্কে দুই চারিটি কথা উত্থাপন করা অসাময়িক না হইতে পারে।

বিজ্ঞানের ভাষার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির অতি নিকট সম্বন্ধ। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই এই সম্বন্ধ জানেন। বিজ্ঞানের ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র। উভয়ত্র ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলেও, একত্র সৌষ্ঠবের দিকে, অন্যত্র সামর্থ্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা না হইলে, বিজ্ঞান পুষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পায় না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন প্রতিভাদ্বারা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষাসংগঠনেও সেইরূপ

সময়ে সময়ে অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতবিদ্যা। গণিতবিদ্যার ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া গণিতবিৎ মনের কথা ব্যক্ত করেন। পাটীগণিতে দশমিক লিপি ও বীজগণিতে সাঙ্কেতিক লিপি যতদিন প্রচলিত না হইয়াছিল, ততদিন ঐ দুই শাস্ত্রের উন্নতির আরম্ভ হয় নাই। ভারতবর্ষ ঐ উভয়বিধ লিপিরই আকরস্থান। ইউরোপে নিউটন ও লাইব্‌নিজ্ একই সময়ে Differential Calculus নামক প্রচণ্ড গণিতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কৃত লিপি লাইব্‌নিজের উদ্ভাবিত লিপিপ্রণালীর নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সহিত পদার্থবিদ্যার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত ভাষা সঙ্কলনের জন্য প্রতিভাবান্ পুরুষগণ আপনাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। মহামতি লাবোয়াশিয়া রসায়নবিদ্যা ও রসায়নের সাঙ্কেতিক্ ভাষা, উভয়েরই জন্মদাতা। এই সাঙ্কেতিক ভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে রসায়নবিদ্যার আজ কি অবস্থা ঘটিত, বলা যায় না।

পরিষদের কর্ত্তব্য সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে অনেক কাজ করিবার আছে; এবং পরিষৎ যদি সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা, কথাটি বড়ই প্রকৃত; এবং ভিন্ন ভিন্ন International Congress প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাষার কতদূর সামর্থ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে পাঁচজনের সমবেত চেষ্টা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ইংরেজি হইতে অনুবাদের সময় যে যে বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব।

ইংরেজি শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তরদান না করিয়া উহাদিগকে অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না, এই কথা প্রথমে বিবেচ্য। সর্ব্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে পরিভাষা প্রণয়নে চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা সাধ্য নহে, কর্ত্তব্যও নহে। ইংরেজিতে এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গলার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে ঐ সকল শব্দ মাতৃভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব।

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজি ভাষা লাটিন গ্রীক ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গলা ভাষাতে আরবী ফারসী ও ইংরেজি শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় শব্দ এখন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র। যখন যে জাতির সহিত ঐতিহাসিক কারণে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট ঋণগ্রহণ না করিলে চলে না। বাঙ্গলাভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ফরাসী পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষার নিকটেও প্রচুর ঋণগ্রহণ আবিষ্কৃত হইবে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণগ্রহণ আবশ্যক; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহা অবশ্যম্ভাবী। এই ঋণগ্রহণে কাতর হইলে চলিবে না; এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই ক্ষতি।

ইংরেজি শিল্পের ও ইংরেজি বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল চেয়ার বাক্স তোরঙ্গ বোতল বিসকুট

প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত, কোর্ট আপীল পুলিস প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কালে মিশিয়া যাইবে। ইহাদের প্রবেশপথ রোধ করিয়া তত্তৎস্থানে খাঁটি দেশী শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে।

রসায়নবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান হইতে এইরূপ ইংরেজি শব্দ আমাদিগকে অকাতরে অবিকল গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য উপায় নাই। রসায়নশাস্ত্রোক্ত সত্তরটা মূল পদার্থের জন্য সত্তরটা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু এমন স্থলেও কথা উঠিতে পারে; Uranium ও Tungsten না হয়, ইংরেজি হইতে অবিকল গ্রহণ করা গেল; Oxygen Hydrogen Chlorine প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী পদার্থেরও কি খাঁটি বাঙ্গলা নাম থাকিবে না? এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া চলে না; সুবিধা বিবেচনায় প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ ভাবে বিচার করিতে হইবে।

বোধ করি কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষার অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পারে। মহৈশ্বর্য্যশালিনী আর্য্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্য দেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল ম্লেচ্ছ বৈদেশিকের সহিত আমাদের আদান

প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও ঋণগ্রহণে এদেশের আচার্য্যেরা কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রাচীনকালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আদান প্রদান চলিয়াছিল। সেই সময়ে সংস্কৃত জ্যোতিষের ভাষায় খাঁটি গ্রীকশব্দ অনেক গুলি প্রবেশ করে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের নিকট এই সংবাদ নূতন, তাঁহাদের অবগতির ও কৌতুহল তৃপ্তির জন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম।

খাঁটি সংস্কৃত	গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত	গ্রীক
মেষ	ক্রিয়	Krios
বৃষ	তাবুরি	Tauros
মিথুন	জিতুম	Didumos
কর্কট	——	Karkinos
সিংহ	লেয়	Leon
কন্যা	পার্থোন	Parthenos
তুলা	জুক	Jugon
বৃশ্চিক	কৌর্প	Skorpios
ধনুঃ	তৌক্ষিক	Toxikos
মকর	আকোকের	Akokeros
কুম্ভ	হৃদ্রোগ	Hudrokoos
মীন	ইথম্	Ikthos
	হেলি	Helios
	হিম্ন	Hermes
	আর	Ares
	জ্যো	Zeus
	কোণ	Kronos

গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত	গ্রীক
আস্ফুজিৎ	Aphrodite
হোরা	hora
কেন্দ্র	kentron
দ্রেক্কাণ	dekanos
লিপ্তা	lepta
অনফা	anaphe
সুনফা	sunaphe
দুরুধরা	doruphoria
আপোক্লিম	apoklima
পণফর	epanaphora
জামিত্র	diametros
ইত্যাদি।	

সুতরাং যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন আমাদের পক্ষেও সেইরূপ ঋণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।

তবে সর্ব্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছপরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। ইংরেজি বিজ্ঞানে গ্রীক ভাষা হইতে প্রভূত পরিমাণে শব্দ সঙ্কলন করা হয়। ইংরেজির সহিত গ্রীকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ তদপেক্ষা প্রচুরভাবে সন্নিকট; অথচ সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাহীন হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা

আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গলা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গলার দাবি কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। চলিত ইংরেজি হইতে কতকগুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন উপযোগী, তেমনি মিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দিলাম—mass, force, stress, strain, step, spin, twist, shear, torque, whirl, squirt, pressure, tension, flux, power, work. বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি প্রত্যেকে সুনির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে। এইরূপে চলিত বাঙ্গলা হইতে কতকগুলি শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি নাম নিম্নে দিলাম। পাঠকেরা ইহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করিবেন।

mass	...	বস্তু
lens	...	পরকলা
prism	...	কলম
wind	...	হাওয়া
work	...	কাজ
tension	...	টান

নূতন শব্দ সঙ্কলনের সময় ব্যবহারে সুবিধার ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে গেলে কাজের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে অভিধান-ছাড়া শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধামত কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে সঙ্কেতমাত্র, ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না।

বলবিজ্ঞান ও তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতি

ব্রিটিশ এসোসিয়েসন যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। রিপোর্টে ব্যাকরণের ও ব্যুৎপত্তির ও বিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। সমিতির রিপোর্ট অনুসারে কতকগুলি অভিধান-ছাড়া ও ব্যাকরণ-দুষ্ট—dyne, erg প্রভৃতি—নূতন শব্দ বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে; এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই সকল জাতির মধ্যেই ঐ সকল শব্দ সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে তাঁহাদের নাম কাটিয়া ছাঁটিয়া কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত :—

Ohm	হইতে	ohm
Volta	...	volt
Ampere	...	ampere
Faraday	...	farad
Watt	...	watt
Joule	...	joule
Henry	...	henri
Coulomb	...	coulomb

পুনশ্চ second এবং ohm সমাসবদ্ধ করিয়া sec-ohm

ampere এবং meter সমাসবদ্ধ করিয়া am-meter

এবং ohm উলটাইয়া mho

পুনশ্চ—

centimetre	=	hundredth of a metre
kilogramme	=	a hundred grammes
megohm	=	a million ohms
microfarad	—	millionth part of a farad
milli-ampere	=	thousandth part of an ampere

gramme-nine = 10^9 grammes

ninth gramme = $\frac{1}{10^9}$ of a gramme

সুবিধা সরলতা শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়া, একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লট্ লোট্ লঙ্ লুঙ্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের দৃষ্টান্ত থাকিতে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গোলমিতি (Spherical Trigonometry) জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতারা কিরূপ সাহসের সহিত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতেন, পুরাতন শব্দকে নূতন সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতেন, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রচলিত কোষগ্রন্থের পাতা খুঁজিয়া শব্দ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায় মন্থর হইত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল শাস্ত্রে যে সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত আছে, আমরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহা এখন গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় যাঁহারা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ বর্ত্তমান থাকিতে তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া নূতন শব্দ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল।

অক্ষান্তর = latitude (terrestrial)

লম্বান্তর = co-latitude

দেশান্তর = longitude

ধ্রুবক = longitude (celestial)

বিক্ষেপ = latitude (celestial)

ক্ষিতিজ	=	horizon
প্রতিবৃত্ত	=	eccentric circle
মন্দফল	=	equation of the centre
উচ্চরেখা	=	line of apsides
মন্দোচ্চ	=	apogee
রবিমধ্য	=	mean sun
চন্দ্রমধ্য	=	mean moon
ভুজজ্যা	=	sine
কোটিজ্যা	=	cosine
ক্রমজ্যা	=	right sine
উৎক্রমজ্যা	=	versed sine
পরিধি	=	circumference (of a great circle)
স্ফুটপরিধি	=	rectified circumference (of a small circle)
কক্ষা	=	orbit
পাত	=	node
স্ফুট, স্পষ্ট	=	corrected, recified, true
ক্রান্তি	=	declination
দৃক্‌সূত্র	=	line of vision
লম্বন	=	parallax
অধিমাস	=	intercalary month
সূচী	=	cone,
স্বয়ংবহ যন্ত্র	=	automatic instrument
শৃঙ্গ	=	cusp
চক্র	=	circle

চাপ	=	semicircle
তূরীয়	=	quadrant
পট্টিকা	=	index arm

ইত্যাদি।

সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্ত্তমান থাকিতেও কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এখনও সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন শব্দ গ্রহণের সময় যায় নাই।

ইংরেজিতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি ভ্রান্তিজনক অর্থ সূচনা করে। অথচ সেগুলি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায় এক্ষণে ভাষায় গাঁথা পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের ভাষা হইতে উহাদের নির্ব্বাসন দুরূহ হইয়াছে। অথচ সেই সকল শব্দ এতই ভ্রমপূর্ণ ভাব আনিয়া ফেলে যে নূতন শিক্ষার্থীর বিষম অসুবিধা হয়। এখন শিক্ষার্থীর জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লেখেন, তাঁহাদিগকে সেই শব্দগুলিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। স্বতন্ত্র টিপ্পনী করিয়া বুঝাইতে হয় যে, এই এই শব্দে যেন এই এই অর্থ বুঝিও না। বাঙ্গালায় সেই সেই ইংরেজি শব্দের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করিলে আমাদেরও সেই বিপদের সম্ভাবনা। নূতন অনুবাদের সময় এই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যেই এইরূপ অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গলা বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকগণ এই বিপদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ইংরেজি Oxygen শব্দের যৌগিক অর্থ অম্লোৎপাদক। উহার বাঙ্গলায় অম্লজান শব্দ গৃহীত হইয়াছে। Oxygen শব্দের যখন সৃষ্টি হয়, তখন পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, অম্ল পদার্থ মাত্রেই ঐ বায়ু বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ ঐ বায়ুর বিদ্যমানতাই পদার্থের অম্লতার কারণ। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে, এমন অনেক তীব্র অম্ল

পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাতে Oxygen একবারেই নাই; এমন কি, অম্লতার কারণ Oxygen নহে, অম্লতার কারণ Hydrogen। এই কারণে এক্ষণে Oxygen শব্দকে যৌগিক শব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া রূঢ় শব্দ রূপে গ্রহণ করিতে হয়। পঙ্কজ যেমন পঙ্কজাত পদার্থ মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝায়, সেইরূপ Oxygen অম্লজনক পদার্থ না বুঝাইয়া এমন কোন পদার্থকে বুঝায়, যাহার সহিত অম্লতার কোন সম্পর্ক না থাকিতেও পারে। Oxygenএর বাঙ্গলায় অম্লজান শব্দ বজায় রাখিলে এখন যে বিশেষ ক্ষতি আছে, তাহা নহে। বরং উহা যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর উহাকে ত্যাগ না করাই ভাল। তবে প্রথম অনুবাদের সময়ে এই আপত্তিটুকুর উপর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত।

ইংরেজি পদার্থবিদ্যায় এমন আরও কতকগুলি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিষচোখে দেখেন। এই শব্দগুলির অস্তিত্বে তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এগুলি ভাষা হইতে কোনরূপে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের যেন শান্তিলাভ হয়। দৃষ্টান্তস্থলে specific heat, latent heat, centrifugal force প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণ উহাদের স্থলে আপেক্ষিক তাপ, গূঢ় তাপ, কেন্দ্রাপসরণবল অথবা কেন্দ্রবিমুখ বল প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন। আমার বিবেচনায় উহাদের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয় নাই। ইংরেজিতে heat ও temperature এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রচলিত ভাষায় অর্থভেদের এই নির্দ্দেশ না থাকায় শিক্ষার্থীরা সহজে উভয়ের পার্থক্য ধরিতে পারে না। বাঙ্গালায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা প্রচলিত হইয়াছে। Heat মাপিবার যন্ত্রের ইংরেজি নাম calorimeter; temperature মাপিবার যন্ত্রের নাম thermometer.

অথচ বাঙ্গলায় thermometer অর্থে তাপমান শব্দ চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু calorimeterএর বাঙ্গলা কি হইবে?

আর একটি মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। ইংরেজি পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় এখনও ব্যবস্থার যেটুকু অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বিজ্ঞানবিদ্যায় শব্দ প্রণয়নের জন্য যেন একটা নূতন ব্যাকরণ গঠিত হইতেছে। বাঙ্গলায় পরিভাষা প্রণয়নের সময় আমাদের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রসায়নশাস্ত্রে ইংরেজিতে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুনিয়ত পরিভাষা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে বুঝি তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিকই রাসায়নিক পরিভাষার সেই শৃঙ্খলা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। পদার্থবিদ্যাতেও সেইরূপ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট পরিভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

পদার্থবিদ্যায় আচার্য্য অলিবার হেবিসাইড্ এবং ফিট্জ্ জেরাল্ড্ যে নূতন পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত দেখিলে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতেও পারে। বাঙ্গলায় যাঁহারা নূতন পরিভাষা প্রণীত করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন, এই প্রার্থনা।

অলিবার হেবিসাইড্ প্রদর্শিত রীতি :—

Conduct*ion*=*phenomenon* of conduction of electricity,

তাড়িত-পরিচালন ব্যাপার

Conduct*ance*=*amount* of electricity conducted

অর্থাৎ পরিচালিত তাড়িতের পরিমাণ

Conduct*ivity*=*co-efficient* of conduction

অর্থাৎ পদার্থ বিশেষের পরিচালন শক্তি

এই রীতি অনুসারে Fitz-Geraldএর প্রস্তাবিত পরিভাষা—

Phenomenon	*Amount*	*Coefficient*
diffusion	diffusance	diffusivity
expansion	expansance	expansivity
gravitation	gravitance	gravitivity
inertia	inertance	intertivity
	(=mass)	(=density)
rotation	rotatance	rotativity

এমন কি,

heat	heatance	heativity
	(=amount of heat)	(=specific heat)

ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, heatance, heativity প্রভৃতি শব্দ শুনিলে শাব্দিক পণ্ডিতেরা সভয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন। কিন্তু আচার্য্য ফিট্জ্ জেরাল্ড সাহসের সহিত বলেন,—"Most of the words appcar at first as if they would prove most awkward in practice, but remembering similar fears (which subsequently proved groundless) in similar matters, one is afraid to say that they are due to more than unfamiliarity". অর্থাৎ আপাততঃ ভয় হইতে পারে, এই সকল শব্দের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইবে; কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই; একবার অভ্যাস হইয়া গেলে এই সকল শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় দিব্য চলিয়া যাইবে।

শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা

বৈদিক সাহিত্যে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞ উপলক্ষে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত। নিহত পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাস নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক্ করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম ছিল শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি। যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার উদ্দেশে যাগ প্রধান যাগ। প্রধান যাগের সম্পূর্ণতার জন্য স্বিষ্টকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশে যাগ করিতে হইত; ইহার নাম স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশটি যাগ করা হইত; তাহার নাম প্রয়াজ যাগ। প্রধান যাগ সম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট যজ্ঞিয় দ্রব্য যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে ভক্ষণ করিতেন। এই ভক্ষণীয় দ্রব্যের নাম ইড়া। উহা ভক্ষণের নাম ইড়া-ভক্ষণ। ইড়া-ভক্ষণেই প্রধান যাগ সমাপ্ত হইত বটে, কিন্তু তৎপরেও কতিপয় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। এই সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য অপর একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশ যাগ অনুষ্ঠিত হইত; ইহার নাম অনুযাজ যাগ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ ও অনুযাজ যাগ সম্পাদন করিতেন। একাদশ অনুযাজ যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা নামক আর একজন ঋত্বিক্ আরও একাদশটি যাগ সম্পাদন করিতেন; ইহার নাম উপযাজ যাগ। এই সমুদয় যাগ যজমানের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হইত॥

আহবনীয় নামক অগ্নিতে মন্ত্রসহকারে যজ্ঞিয় দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা যাগ অনুষ্ঠিত হইত। যজমান সপত্নীক হইয়া যাগ করিতেন। যজমানের পত্নী স্বামীর সমান ফল পাইতেন। তৎসত্ত্বেও যজমানপত্নীর পক্ষ হইতে দেবপত্নী-গণের উদ্দেশে পৃথক্‌ভাবে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম পত্নীসংযাজ যাগ। গার্হপত্য নামক অগ্নিতে এই পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত।

পশুবধের পর পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শামিত্র অগ্নিতে পাক করিয়া ঐ সমুদয় যাগ,—প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ, অনুযাজ যাগ, উপযাজ যাগ এবং পত্নী-সংযাজ যাগ,—অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ যাগে পশুর কোন্ অঙ্গ যজ্ঞিয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তাহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সকল বিধি পাওয়া যায়। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ হইতে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

সঙ্কলিত শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সংশয় ঘটিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে শ্রৌত কর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন যাজ্ঞিকেরা ঐ সকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত জানিতেন। ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের যে সকল ভাষ্য বা বৃত্তি এখন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদিগের মধ্যে কতিপয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় শ্রৌত-কর্ম্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ মতভেদের হেতু জন্মিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই সমুদয় নাম প্রচলিত আছে কি না, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আমি যে শব্দগুলি পাইয়াছি, ভাষ্যকার বা বৃত্তিকার কর্ত্তৃক লিখিত অর্থ সহিত তাহার তালিকা করিয়া দিলাম।

মার্টিন হোগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ সেই অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পশুযজ্ঞ প্রকরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। সমুদয় বৈদিক-সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এরূপ শব্দ বহু সংখ্যায় মিলিতে পারে। সেরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ আমার নাই। চোখের উপর যাহা পড়িয়াছে, তাহাই এস্থানে সঙ্কলিত করিলাম। বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি উপকৃত হইবেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে যজমানের দীক্ষা উপলক্ষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রযাজ যাগ উপলক্ষে এবং এক বিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পশুবিভাগ উপলক্ষে অনেকগুলি শব্দ আছে। আমার অনুবাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঐতয়ের ব্রাহ্মণ পুস্তকে শব্দগুলি যথাস্থানে পাওয়া যাইবে।

মার্টিন হোগের ইংরেজি প্রতিশব্দের সহিত আবশ্যক স্থলে সায়ণ-ভাষ্যোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। তদ্ব্যতীত মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি সংহিতা হইতে এবং কাত্যায়নের ও আপস্তম্বের শ্রৌতসূত্র হইতে কতিপয় শব্দ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৩

যোনি	womb
গর্ভ	embryo
উল্ব	caul (গর্ভস্থ অভ্যন্তরং চর্ম্ম সর্ব্ববেষ্টনম্—সায়ণ)
[illegible]	placenta

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৬।৬

চক্ষুঃ	eye
প্রাণ	breath
অসু	life
শ্রোত্র	hearing
শরীর	body
ত্বক্	skin
নাভি	navel
বপা	omentum
উচ্ছ্বাস	breathing
বক্ষঃ	breast
বাহু	arm
দোষণী (প্রকোষ্ঠৌ)	forearms
অংস	shoulder
শ্রোণি	loin
উরু	thigh
বঙ্ক্রি (ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক)	rib—পার্শ্বাস্থি (সায়ণ)
উবধ্য	excrement—পুরীষ (সায়ণ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৬।৭

বনিষ্ঠু	entrails (?)—বপায়াঃ সমীপবর্ত্তী মাংস-খণ্ডঃ (সায়ণ)
জিহ্বা	tongue

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২১।১

হনু	jawbone
কণ্ঠ	throat
কাকুদ্র	palate
শ্রোণি	loin
সক্থি	thigh—উর্বধোভাগঃ (সায়ণ)
পার্শ্ব	side
অংস	shoulder
দোঃ	arm—বাহুঃ (সায়ণ)
উরু	thigh
অনূক	urinal bladder—মূত্র-বস্তি (সায়ণ)
সদ	backbone—পৃষ্ঠবংশ (সায়ণ)
পাদ	foot
ওষ্ঠ	upper lip
জাঘনী	tail—পুচ্ছ (সায়ণ)
স্কন্ধ	neck
মণিকা	fleshy portion in neck—স্কন্ধে ভবা মণিসদৃশা মাংসখণ্ডাঃ (সায়ণ)
কীকস	gristle—কীকসাঃ পার্শ্বে স্থিতা মাংসশকলাঃ (সায়ণ)
বৈকর্ত্ত	fleshy part on the back—প্রৌঢ়ো মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)
ক্লোমা	left lobe—হৃদয়পার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)
শিরঃ	head
অজিন	skin

মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা—২৫ অধ্যায়—
অশ্বমেধ প্রকরণে পশ্বঙ্গের নাম—মহীধর-ভাষ্যোক্ত
ব্যাখ্যা সমেত—

দৎ	দন্ত
দন্তমূল	
বর্স্ব	দন্তপীঠ
দংষ্ট্রা	
অগ্রজিহ্বা	
জিহ্বা	
তালু	
হনু	বক্ত্রৈকদেশ
আস্য	মুখ
আণ্ড	বৃষণ
শ্মশ্রু	মুখকেশ
ভ্রূ	ললাটগ রোমপঙ্‌ক্তি
বর্ত্তঃ	পক্ষ্মপঙ্‌ক্তি
কনীনক	নেত্রমধ্যস্থ কৃষ্ণগোল
পক্ষ্ম	
ইক্ষু	নেত্রাধোভাগ-রোম
অধর ওষ্ঠ	
উত্তর ওষ্ঠ	
মূর্দ্ধা	মস্তক
নির্ব্বাধ	শিরোঽস্থি-মধ্য-সংলগ্ন মজ্জাভাগ
মস্তিষ্ক	শিরোমধ্যস্থ জর্জ্জর মাংসভাগ (মস্তকমজ্জা ইতি ক্ষীর স্বামী)

কর্ণ	কর্ণশস্কুলী
শ্রোত্র	শ্রোত্রেন্দ্রিয়
অধর কণ্ঠ	কণ্ঠাধোভাগ
শুষ্ক কণ্ঠ	কণ্ঠস্য যঃ শুষ্কো নির্মাংসো দেশঃ
মন্যা	গ্রীবাপশ্চাদ্‌ভাগে কৃকাটিকায়াং শিরা মন্যা মন্যতে (পশ্চাদ্-গ্রীবা শিরা মন্যা ইতি অমরঃ)
শীর্ষ	শিরঃ
কেশ	অশ্বপক্ষে স্কন্ধস্থ রোম
বহ	স্কন্ধ
শফ	খুর
স্থূর	গুল্‌ফ
খক্ষলা	গুল্‌ফাধঃস্থা নাড়ী
জঙ্ঘা	গুল্‌ফ জানুনোঃ মধ্যভাগঃ
বাহু	অগ্রপাদস্য জানূর্দ্ধভাগঃ
জাম্বীর	জম্বীরফলাকার জানুমধ্যভাগঃ
মতিরুক্	জানু দেশ
দোঃ	কর—অগ্রপাদস্য জান্বধোভাগঃ
অংস	স্কন্ধ
রোর	অংসগ্রন্থি
পক্ষতি	পক্ষস্য পার্শ্বস্য মূলভূতং অস্থি বঙ্ক্রি শব্দ বাচ্যম্। তানি চ প্রতিপার্শ্বং ত্রয়োদশ ভবন্তি।
নিপক্ষতি	দ্বিতীয় পক্ষতি
স্কন্ধ	
কীকস	অশ্বপুচ্ছোপরি তিস্রোঽস্থিপঙ্ক্তয়ঃ সন্তি তানি অস্থিপঙ্ক্তীনি কীকসানি

পুচ্ছ	
ভাসদ	নিতম্ব
শ্রোণি	কটি
ঊরু	
অল্প	বঙ্ক্ষণ, ঊরুসন্ধি
স্থূর	স্থূলঃ ফিচঃ নিতম্বাধোভাগঃ
কুষ্ঠ	নিতম্বস্থঃ কূপকঃ আবর্ত্ত ককুন্দরশব্দবাচী
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্র
স্থূলগুদা	গুদা = গুদং পায়ুঃ তস্য স্থূলভাগঃ
আন্ত্র	মন্ত্রসম্বন্ধীয় মাংসভাগ
বস্তি	মূত্রপুট
আণ্ড	অণ্ড, মুষ্ক
শেপ	লিঙ্গ
রেতঃ	শুক্র
পিত্ত	ধাতুবিশেষঃ
পায়ু	
শকপিণ্ড	বিষ্ঠাপিণ্ড
ক্রোড়	বক্ষো মধ্যভাগ
পাজস্য	বলকরমঙ্গম্
জত্রু	অংসকক্ষয়োঃ সন্ধিঃ
ভসৎ	লিঙ্গাগ্র
হৃদয়োপশ	হৃদয়স্থ মাংস
পুরীতৎ	হৃদয়াচ্ছাদক অন্ত্র
উদর্য্য	উদরস্থ মাংস
মতস্ন	গ্রীবাধস্তাদ্ভাগস্থিত-হৃদয়োভয়-পার্শ্বস্থে অস্থিনী

	মতান্তে
বৃক্ক	কুক্ষিস্থ আম্রফলাকৃতি মাংসগোলক
প্লাশি	শিশ্নমূলনাড়ী
প্লীহা	হৃদয়বামভাগে শিথিলো মাংসভাগঃ পুপ্পুস-সংজ্ঞঃ
ক্লোমা	উদরস্থ জলাধারঃ (ক্লোমা গলনাড়ী ইতি কর্কঃ ; হৃদয়স্য দক্ষিণে ক্লোমা বামে প্লীহা পুপ্পুসশ্চ ইতি বৈদ্যা ইতি ক্ষীরস্বামী)
গ্নৌ	হৃদয় নাড়ী
হিরা	অন্নবাহিনী নাড়ী
কুক্ষি	উদরস্থ দক্ষবামভাগৌ কুক্ষী
উদর	জঠর
নাভি	
রস	ধাতুবিশেষঃ, বীর্য্যম্
যূষ	পকান্ন-রস
বসা	মেদ
অশ্রু	নেত্রাম্বু
দূষিকা	নেত্রমল
অসা	অসৃক, রুধির
ত্বক	চর্ম্ম

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ৬ অধ্যায় ৭ কণ্ডিকা পশুযাগপ্রকরণে—যাজ্ঞিকদেবকৃত ব্যাখ্যা সমেত—

হৃদয়ম্	আম্রফলসদৃশম্
জিহ্বা	রসনা

ক্রোড়ম্	বক্ষোভূজান্তরম্
সব্যসক্থি পৃষ্ঠনড়কম্	সব্যস্য বাহোঃ প্রথমং নড়কং অংসাদধো বর্ত্তমানম্
পার্শ্বে	দ্বে পার্শ্বে একৈকং এয়োদশ বঙ্‌ক্র্যাত্মকম্
যকৃৎ	কালেয়ম্
বৃক্কৌ	কুক্ষিস্থৌ গোলকৌ মহদামলকতুল্যৌ আম্র-ফলাকৃতী ইতি ধূর্ত্তস্বামী
গুদমধ্যম্	গুদস্য মধ্যং যেন শকৃৎ নির্গচ্ছতি তদ্বিষমং ত্রেধা কৃত্বা তস্য যো মধ্যমো ভাগ ন স্থূলঃ ন চ কৃশঃ
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	কটি দক্ষিণাপর সকৃথ্নঃ উপরি বর্ত্তমানঃ মাংসলঃ প্রদেশঃ। শ্রোণিঃ দক্ষিণা স্ফিক্ ইতি ধূর্ত্তস্বামী
দক্ষিণসক্থি পৃষ্ঠনড়কম্	দক্ষিণস্য বাহোঃ প্রথম নলকং, আংসাদধ এবাবস্থিতম্
গুদতৃতীয়াণিষ্ঠম্	আন্ত্রস্য যোহণিষ্ঠঃ অতিশয়েন অণুঃ অতিকৃশঃ তৃতীয়ো ভাগঃ
সব্যা শ্রোণিঃ	উত্তরাপর-সকৃথ্ন উপরিভাগে মাংসলঃ প্রদেশঃ কটি-শব্দবাচ্যঃ
বর্ষিষ্ঠম্	অতিশয়েন মহৎ বর্ষিষ্ঠং যদ্ গুদতৃতীয়মতি স্থূলম্
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্রম্
জাঘনী	জঘনপ্রদেশে ভবা পুচ্ছদণ্ড ইত্যর্থঃ। জাঘনী পশোঃ পুচ্ছমিতি হরিস্বামী। জাঘনী বালদণ্ড ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। জাঘনী

	যেন মশকানপনয়তীতি ধূর্ত্তস্বামী। জাঘনী বালধিরুচ্যতে ইতি জ্ঞানদীপিকাকারঃ।
ক্লোম	গলনাড়িকা
প্লীহঃ	পীহ ইতি যঃ প্রসিদ্ধঃ
অধ্যুধ্নী	শতপুট উধস উপরি ভবতি
পুরীতৎ	হৃদয়ং প্রচ্ছাদিতং যেন মাংসেন তৎ
মেদ	
উবধ্যং	পুরীষম্
লোহিতম্	রুধিরম্
বপা	
বসা	

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে—

৭ প্রশ্ন ২২-২৭ কণ্ডিকা—পশুযজ্ঞ প্রকরণ—

ভট্টরুদ্রদত্ত প্রণীত বৃত্তি সমেত—

হৃদয়	
জিহ্বা	
বক্ষঃ	
যকৃৎ	কালখণ্ডং নাম ম্রদীয়ো মাংসম্
বৃক্যৌ	পার্শ্বগতৌ পিণ্ডৌ
সব্যং দোঃ	
উভে পার্শ্বে	
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	
গুদতৃতীয়ম্	
দক্ষিণং দোঃ	
সব্যা শ্রোণিঃ	

ক্লোমা	যকৃৎসদৃশম্ তিলকাখ্যং মাংসম্
প্লীহা	গুল্ম
পুরীতৎ	অন্ত্রম্
বনিষ্ঠুঃ	স্থবিষ্ঠান্ত্রম্
অধ্যৃধ্রী	ঊধঃ-স্থানীয়ং মাংসম্
মেদঃ	চর্ম্ম হৃদয়স্য বৃক্যয়োশ্চ
জাঘনী	পুচ্ছম্
যূষ	পশুরসঃ
বসা	পশুরসঃ
অংসৌ	স্কন্ধৌ
অণৃকঃ	অন্তরাস্থিবিশেষঃ
অপর সকৃথিনী	শ্রোণ্যোরুপরিদেশৌ

বৈদ্যক পরিভাষা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কিছুদিন হইল আমি একখানি পুস্তক দেখিবার জন্য লইয়াছিলাম। পুস্তকখানি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পত্তি। পুস্তকের টাইটেল পেজে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর রহিয়াছে। পুস্তকখানির নাম A Vocabulary of the Names of the various parts of the Human Body and of Medical and Technical Terms in English, Arabic, Persian, Hindee and Sanskrit for the use of the Members of the Medical Department in India. গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা Peter Breton, Surgeon in the Service of the Hon'ble East India Company and Superintendent of the Native Medical Institution. পুস্তকখানি ১৮২৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত। তদানীন্তন মেডিকাল বোর্ডের সভাপতি ও মেম্বারগণকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে।

স্থানীয় ইংরেজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঘটিত বিবিধ পারিভাষিক শব্দের তালিকা গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঁচটি স্তম্ভে পারিভাষিক শব্দগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে ইংরেজি শব্দ, তৎপরে আরবী, পারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ পর পর সাজান আছে। পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম ভাগে সমস্ত তালিকা ইংরেজি হরপে, দ্বিতীয় ভাগে নাগরী ও তৃতীয় ভাগে পারসী হরপে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত। সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহকার নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।

Wilson's Sanskrit Dictionary

Chikitsa, Practice of Physic

Soosrut

Nidaun, Pathology

Bhao Prikash, Revealer of Thoughts.

সঙ্কলনকর্ত্তা পরিভাষাসঙ্কলনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং গ্রন্থকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর চিকিৎসাবিদ্যার যে পরিমাণ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এত নূতন নূতন শব্দ বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে, ও পুরাতন শব্দের অর্থবিকার ঘটিয়াছে, যে এই তালিকা একালের পক্ষে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। তথাপি এ বিষয়ে এত বড় বাঙ্গলা পরিভাষা আর কোথাও সঙ্কলিত দেখি নাই। একালেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ও চিকিৎসা-গ্রন্থ-লেখকগণের কাজে আসিবে, এই বিবেচনায় ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলি ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল ; কোনরূপ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিলাম না।

Parts of the Body.

alveoli	দন্ত, দশন, রসন
ankle	ঘুণ্টক, ঘুন্টিকা, গুল্‌ফ
arm	বাহু
arm, upper	ভুজ, প্রগল্‌ভ
arm, lower	প্রকোষ্ঠ
arm pit	কক্ষ

artery	বায়ুবাহিনী, ধমনী
back	পৃষ্ঠ
back-bone or spine	পৃষ্ঠবংশ
beard	শ্মশ্রু
belly	উদর
bladder	ক্লোম
blood	রক্ত
blood-vessel	রক্তবাহিনী
body	গাত্র, দেহ, শরীর
bone	অস্থি
brain	মস্তলুঙ্গ
breast	উরোজ, কুচ
breath	শ্বাস
buttocks	প্রোথ
canthus, inner	——
canthus, outer	অপাঙ্গ
cartilage or gristle	কুর্চ্চা
cheek	কপোল
chest	উরস্
chin	চিবুক
chyle	ধাতুপ
chyme	——
clavicle	জত্রু

diaphragm	——
ear	কর্ণ, শ্রবণ
ear, tip of the	কর্ণপালী
ear-wax	কর্ণমল
elbow	কফোণি
eye	নয়ন, নেত্র, অক্ষি
eyebrow	ভ্রূ
eye-lash	পক্ষ্ম
eyelid	বর্ত্ম
eye, pupil of the	কনীনিকা
eye, rheum of the	নেত্রমল
eye, socket of the	অক্ষিকোষ
eye, white of the	নেত্র-শ্বেতভাগ
excrement	বিষ্ঠা
excretory duct	স্রোতপথ
face	আনন
fat	মেদ, মেধস্
fibre	রজ্জু
finger	অঙ্গুলি
finger, fore	তর্জ্জনী
finger, little	কনিষ্ঠিকা
finger middle	মধ্যমা
finger, ring-	অনামিকা
finger, top of the	অঙ্গুল্যগ্র

fist	মুষ্টি
flesh	মাংস
foetus	গর্ভ, ভ্রূণ
foot	পাদ
foot, sole of the	পাদতল
forehead	ভাল, ললাট
gall-bladder	পিত্তাশয়
gland	পিণ্ড
gristle or cartilage	কুর্চ্চা
groin	বঙ্ক্ষণ
gullet or oesophagus	গল
gum	দন্তবেষ্ট
hair	কেশ
hand	হস্ত, কর
hand, back of the	হস্ত-পৃষ্ঠ
hand, left	বামহস্ত
hand, palm of the	হস্ততল
hand, right	দক্ষিণ হস্ত
head	শিরস্
heart	হৃদ
heel	পাদমূল, পার্ষ্ণি
hip	কট
humour	রস

instep	পিচণ্ডিকা
intestine	অন্ত্র
jaw	হনু
jaw, lower	অধোহনু
jaw, upper	উর্দ্ধহনু
joint	গ্রন্থি, সন্ধি
knee	জানু
knee-pan	নলকিনী
knuckle	অঙ্গুলিসন্ধি
leg	জঙ্ঘা
leg, calf of the	পিণ্ডলী
ligaments	সন্ধিবন্ধন
lip	ওষ্ঠ
liver	যকৃৎ
loins	কটী
lungs	ফুস্‌ফুস
marrow	মজ্জা, মজ্জন্
member	অঙ্গ, অবয়ব
membrane	সূক্ষ্ম ত্বক্
menses	আর্ত্তব
milk	পয়ঃ
mouth	মুখ
muscle	মাংসপেশী, স্নায়ু

nail	নখ
navel	নাভি
navel-string	নাল
neck	গ্রীবা
neck, nape of the	অবটু
nerve	——
nipple	চুচুক
nose	নাসা, নাসিকা
nose, mucus of the	নাসিকামল
nostril	নাসারন্ধ্র
palate	তালু
penis	লিঙ্গ, শিশ্ন
pericardium	হৃদাশয়
peritoneum	——.
phlegm	কফ .
placenta	পোত্রী
pore	রোমকূপ
pulse	নাড়ী
rib	পার্শ্বাস্থি
saliva	দ্রাবিকা, নিষ্ঠীব
scrotum	অণ্ডকোষ
secretion	রস
shoulder	স্কন্ধ

side	পার্শ্ব
sinew or tenden	শিরা
skeleton	অস্থিপঞ্জর
skin	ত্বক্
skull	খর্পর
spine or backbone	পৃষ্ঠবংশ
skleen	প্লীহা
stomach	পক্বাশয়
suture	সেবনী
sweat	স্বেদ
tear	অশ্রু
temple	শঙ্খ
tendo achilles	পিণ্ডলী শিরা
tendon or sinew	শিরা
testicle	অণ্ড
thigh	সক্থি
throat	কণ্ঠ
thumb	অঙ্গুষ্ঠ
toe	পাদাঙ্গুলি
toe, great	পাদাঙ্গুষ্ঠ

tongue	রসনা, জিহ্বা
tonsil	———
tooth	দন্ত, দশন, রসন
trachea or wind-pipe	কণ্ঠ, ঘণ্টিকা
urethra	মূত্রদ্বার, মূত্রপ্রবাহিণী
urine	মূত্র
uvula	প্রতিজিহ্বা
vein	শিরা
womb	গর্ভাধান, গর্ভস্থান, কুক্ষি
wrist	মণিবন্ধ

Accidents of the Body.

adolescence	যুবত্ব
baldness	চন্দিল
blindness	দৃষ্টিলুপ্ত, অন্ধত্ব
childhood	বালত্ব
deafness	বধিরত্ব
digestion	জীর্ণ, পচন, পাক
dream	স্বপ্ন
dumbness	মূকত্ব
fatness	স্থূলত্ব, তুন্দিলত্ব

hair, curling	কুটিল কেশ
hair, grey	শ্বেতকেশ, পলিত
humpback	কুব্জতা
hunger	ক্ষুধা
lameness	খঞ্জতা
leanness	দুর্ব্বলত্ব
lowness	খর্ব্বতা, লঘুত্ব
old age	বৃদ্ধত্ব
pregnancy	গর্ভাধান
scurf	দারুণক
sleep	নিদ্রা
slenderness	সুকুমারত্ব
sneezing	ছিক্কা
soundness	অরোগতা
speech	বচন, বাক্
squinting	বক্রদৃষ্টি
stammering	স্খলিতবাক্
stretching of the limbs	অঙ্গমোটন
tallness	দীর্ঘতা
thirst	পিপাসা, তৃষ্ণা
tingling sensation felt when a limb is asleep	ঝিঞ্ঝিনী

voice	স্বন, শব্দ
wart	মাংসবৃদ্ধি
watching	জাগরণ
wrinkle	বলি
yawning	

Diseases

abortion	গর্ভপাত
ague	শীতজ্বর
amaurosis	কাচ
anasarca	জলোত্তরণ
apoplexy	অঙ্গবিকৃতি
appetite voracious	ভস্মক
ascarides	ক্ষুদ্রকৃমি
asthma	শঙ্কা, কাশশ্বাস
blister	স্ফোট
blear-eyedness	ক্লিন্নাক্ষ
boil	স্ফোট, স্ফোটক
boil, throbbing of	স্ফোট, স্ফুরণ
bloody flux	রক্তাতিসার
borborygmi	আধ্মাত
boulimus	ভস্মক
bronchocele	গলগণ্ড

bruise	ঘাত
bubo	বিস্ফোট
cataract	মৌক্তিক বিন্দু
catarrh	প্রতিশ্যায়
chancre	শিশ্ন বিস্ফোট
chilblain	বিপাদিকা
cholera morbus	বিসূচিকা
cholic	বাতশূল
cholic, flatulent	বাতগুল্ম
coin of the foot	গোখুর
cold	প্রতিশ্যায়
consumption	ক্ষয়
costiveness	অনাহ, কোষ্ঠবন্ধ
cough	কাশ
crisis	জ্বরমুক্তি
day-blindness	দিনান্ধ
delirium	রোগপ্রলাপ
diabetes	মধুপ্রমেহ
diarrhoea	অতিসার
diagnosis	——
dislocalion	গ্রন্থিবিশ্লেষ
distortion of the face	অর্দ্দিত
dropsy	জলোদর

dysentery	রক্তাতিসার
dysopia luminis	দিনান্ধ
elephantiasis	শ্লীপদ
emprosthotonos	অন্তরায়াম
empyema	বিদ্রধি
epilepsy	অপস্মার
episthotonos	বাহ্যায়াম
eructation	বায়ূদ্গার
fainting	মূর্চ্ছা
fever	জ্বর
fever, accession of	জ্বরাগম
fever, ardent	সতত জ্বর
fever, hectic	জ্বর ক্ষয়ী
film	পুষ্প
fistula	নাড়ীব্রণ
fistula in ano	ভগন্দর
flatulence	উদাবর্ত্ত, বায়ূদ্গম
fracture	অস্থিভঙ্গ
gangrene	অজীব
goitre	গলগণ্ড
gonorrhaea	প্রমেহ
gout	গৃধ্রসী
granulation	মাংসাঙ্কুর

gravel	অশ্মরী
guniea-worm	জলসূত্র
gumboil	দ্বিজব্রণ
gutta-screna	তিমির, কজ্জলবিন্দু
haemorrhage	রক্তপ্রবাহ
hair in the eye	লোহিতার্শ
hare-lip	খণ্ডোষ্ঠত্ব
headache	শিরোরুজ
hemicrania	অর্দ্ধকপালী
hemiplegia	অর্দ্ধাঙ্গ
hernia	অন্ত্রবৃদ্ধি
hiccough, hiccup	হিক্কা
hoarseness	স্বরভেদ
horripilation	রোমাঞ্চ
hydrocele	কোষবৃদ্ধি
hydrocephalus	শিরোগত জল
hydrothorax	উরোগত জল
indigestion	অজীর্ণ
inflammation	দাহ
intermittent	একান্তর
itch	পামা, কণ্ডূতি
jaundice	কামলা, কমলবদ্ধ, পাণ্ডুরোগ
laxation	গ্রন্থিবিশ্লেষ

leprosy	কুষ্ঠ
lethargy	নিদ্রালু
lippitudo	ক্লিন্নাক্ষ
liver	যকৃৎপীড়া
liver, obstruction of the	যকৃৎ বিবন্ধ
locked-jaw	দন্তলগ্ন
looseness	অতিসার
lues	উপদংশ
lumbrice	বর্ত্তুল কৃমি
madness	উন্মাদ
maggots	কৃমি
matter	পূয
measles	পনসিকা
menorrhagia	প্রদর
nedyusa	তৃষ্ণা
night-blindness	রাত্র্যন্ধ
nightmare	দুঃস্বপ্ন
nose, bleeding of the	নাকসীর ?
nose, polypus of the	নাসিকার্শ
numbness	শূন্য
nyctalopio	রাত্র্যন্ধ
ophthalmia	অর্বুদ
pain	ব্যথা

palsy	শীতাঙ্গ
palpitation	হৃৎকম্প
paroxysm	জ্বরকাল
piles	অর্শ
pimple	পামা
plague	মহামারী
plethora	অতিরক্ত
pleurisy	পার্শ্বশূল
pox	উপদংশ
prickly heat	ক্ষুদ্রস্ফোট
prolapsus ani	গুদভ্রংশ
prolapous uteri	যোন্যর্শস্
pterygion	লোহিতার্শ
pus	পূয
pustule	বটী
quartan	চাতুর্থিক জ্বর
quotidian	আহ্নিক জ্বর
rheumatism	বাত, গ্রন্থি বাত
rheumatism, acute	বাত, রক্ত, বায়ু
ringworm	চকাবী, দ্রদ্রু
rupture	অন্ত্রবৃদ্ধি
scab	পর্পটি
scaldhead	অরুংষিকা

sear	কিণ, ব্রণ চিহ্ন
scrofula	কণ্ঠমালা
sickness	রোগ, আময়
sickness at stomach	অরুচি
small pox	মসূরিকা, বাসন্তিকা
sore	ক্ষত
sore throat	গল পাড়া
spasm	অঙ্গগ্রহ
spleen	প্লীহোদর
stone	বৃহদশ্মরী
strangury	মূত্রাঘাত
stroke of the sun	সূর্য্য কিরণ
stroke of the wind	বাতাঘাত
sty in the eye	গুহাঞ্জলী
skdden death	অকাল মৃত্যু
swelling	স্বপথু, শোথ
symptom	লক্ষণ
taenia tapeworm }	দীর্ঘ ক্রিমি
tenesmus	শূল
tetanus	ধনুষ্টঙ্কার, ধনুস্তম্ভ
tertian	তৃতীয় জ্বর
toothache	দন্ত পীড়া
torpor	বিসংজ্ঞ
thirst, excessive	তৃষ্ণা

thrush	——
trismus	দন্তলগ্ন
urethra, stricture of the	মূত্র স্রোত নিবন্ধ
urinae, ardor,	মূত্রদাহ
urine, difficulty in voiding	মূত্রকৃচ্ছ্র
vertigo	ভ্রমণী
vomiting	বমন, ছর্দ্দি
weakness	নির্ব্বলতা, বলহীনতা, বলক্ষয়
worms	ক্রিমিরোগ
wound	ব্রণ
wound, healing of a	ব্রণ পূর্ত্তি

Qualities

anodyne	নিদ্রাকারী
antidote	বিষঘ্ন
anthelmintic	ক্রিমিঘ্ন
aphrodisiac	বাজীকরণ
appetite, promoter of	ক্ষুধাকারী
aromatic	ঔষধ সুগন্ধ
astringent	কোষ্ঠবন্ধক

cardiac	হৃদ্‌বলদ
carminative	বায়ুনাশক
cathartic	ভেদক, রেচক
caustic	ক্ষার কর্ম্মণ্য
cautery	দাহক, অগ্নি কর্ম্মণ্য
cephalic	শিরোবলদ
cholagogue	পিত্তভেদক
cicatrisant	পর্প টীকর
coagulent	সংযমনকর
condiments	উপস্কর, উষ্মদ্রব্য
corroborant	বলপ্রদ
demulcent	আর্দ্রীকরণ
deobstruent	বন্ধঘ্নী
depillatory	লোমপাতন, লোমাপহারক
detergent	বিস্রাবণ, ব্রণশুদ্ধিকর
digestive	ব্রণরোহণকর, মাসাঙ্কুরকারী
——	পাচক, পাচন
discutient	শোথঘ্নী
diuretic	মূত্রল
emetic	বামক
epulotic	পর্প টীকর
errhine	ছিক্কাকারী
exhilarant	হর্ষকর
expectorant	শ্লেষ্মহর

hepatic	যকৃদ্‌বলদ
hypnotic	নিদ্রাকারী
inebrient	মাদক, মৃদুভেদক
lithotriptic	অশ্মরীচূর্ণক
mucilaginous	পিচ্ছিল
narcotic	শূন্যকারক
poison	গরল
refrigerant	শীতলকর
relaxant	শিথিলকারী
repellent	স্তম্ভনকর
rubefacient	লোহিতকর
sedative	প্রহ্লাদন
soporific	নিদ্রাকারী
sternutatory	ছিক্কাকারী
stomachic	পাচক, পাচন
styptic	রক্তস্থগিঘ্ন
sudorific	স্বেদকারী
suppurative	শোথপক্ককারী
thirst, exciter of	তৃট্‌কর, তৃষাকারী
tonic	পক্বাশয় বলদ

vermifuge	কৃমিঘ্ন
vesicant	স্ফোটকারী

Forms of Remedies

abstinence	সংযম
anointing with oil	তৈলমর্দ্দন
applying leeches	জলৌকাক্রিয়া
bath, vapor	সবাষ্প স্বেদ
bath, warm	রোগিস্থিতে উষ্ণ জল
besmearing	লিপ্তি
blood letting	শিরাব্যধি
bougie	মূত্রবন্ধাপহারণী শলাকা
cataplasm	লোপত্রী
caustic	ক্ষারকর্ম্ম
cautery	দাহকর্ম্ম
collyrium	অঞ্জন
compound powder	মিশ্রিত চূর্ণ
confection	মোদক
cosmetic	অভ্যঞ্জন
cupping	শৃঙ্গীক্রিয়া, তুম্বীক্রিয়া
decoction	ক্বাথ
dentifrice	প্রতিসারণ
diet	পথ্য

dose	মাত্রা, পরিমাণ
drink	পেয়
electuary	আলেহ্য
embrocation	স্নেহন
enema	বস্তিক্রিয়া
fasting	উপবাস, উপবস্ত
fluid scent	আঘ্রাণার্দ্রসুগন্ধৌষধ
fomentation	আশেক্যন
fracture, setting a	ভগ্নাস্থিবন্ধন
fumigation	ধূপন
gargarism	গণ্ডূষ
infusion	শীত কষায়
injection for the urethra	মূত্রনাড়ীপ্রক্ষালক
liniment	স্নেহন
lotion	অভ্যঞ্জন
lozenge	মুখবর্ত্তিকা
ointment	আলেপ
pediluvium	পাদপ্রক্ষালন
perfume	আঘ্রাণার্দ্রসুগন্ধৌষধ
pessary	উত্থাপক
pill	বটিকা
plastering	লিপ্তি

plug	স্থাপক
poultice	লোপ্ত্রী
powder	চূর্ণ
rinsing the month	আচমন
seton	বর্ত্তি
smelling medicines	আঘ্রাণৌষধ
solution	কষায়
sprinkling powder on ulcers	ব্রণসেচন চূর্ণ
succedaneum	প্রতিনিধি
suppository	স্থাপক
tampon	উত্থাপক
vehicle	অনুপান

Instrumend Articles

amputating knife	ক্ষুরক
bandage	পট্টিকা
bathing tub	দ্রোণ
canula	নাড়ী
catheter	—
cauterizing iron	তপ্তায়স্
cotton	তূলা
cupping glass	শৃঙ্গী, তুম্বী

dosil	স্থূলপট্টিকা
file	উখ
fillet	বন্ধনী
forceps	স্বস্তিক, সন্দংশ
glyster syringe	গুদ বস্তি
gum lancet	দন্তবেষ্টছেদক
instrument	শস্ত্র, অস্ত্র
lancet	বেধী
leech	জলৌকা
lint	মৃদু বস্ত্র
medicine chest	ঔষধমঞ্জুষা
mortar	খল
pad	স্থূলপট্টিকা
paper of medicine	পুটিকা
penis syringe	মেঢ্রবস্তি
pestle	মুষল
plaster	স্নেহপট্টিকা
pounding mortar	উদুখল
probe	এষণী শলাকা
razor	ক্ষুর
saw	করপত্র
scale	তুলা

scalpel	ক্ষুরিকা
scissors	কর্ত্তরী
scarificator	ছেদনী, লেখনী
slips of plaster	খণ্ডপট্টিকা
splint	কাষ্ঠময় পত্রক
spoon	দর্ব্বী
sticking plaster	দ্রবপট্টিকা
tenaculum	বড়িশ, অঙ্কুশ
tongs	স্বস্তিক, সন্দংশ
tooth instrument	দন্ত শঙ্কু
trocar	বৃত্তাগ্র
tweezers	সন্দংশিকা
weight	প্রমাণ

General Terms

alembic	ভগযন্ত্র
analogy	সমতা, অনুমান
analysis	অনুক্রমচর্চ্চা
anatomy	শরীরব্যবচ্ছেদ বিদ্যা
anomaly	অসামান্য
apothecary	ভৈষজ্যকারী
attraction	আকর্ষ
blood, circulation of the	রুধিরাভিসরণ

cause and effect	কারণ ও কার্য্য
chemistry	রসায়ন
coagulation	সংযমন
collapse	সম্মোহন
compound	মিশ্রিত
concavity	অন্তর্বর্ত্তুলত্ব
condensation	গাঢ়ভবন
contraction	সঙ্কোচ
convexity	বহির্বর্ত্তুলত্ব
crucible	মূষা
crystallization	—
definition	লক্ষণ
diastole, dilatation	প্রসার
distillation	সংস্রাবণ
ductility	পরিকর্ষ
elastic	সঙ্কোচপ্রসারযুক্ত
elasticity	সঙ্কোচপ্রসার
electricity	গুণতৃণমণি, তৃণমণিভাব
element	বস্তু
essence	সার
evaporation	শুষ্ককরণ
experiment	পরীক্ষা
fermentation	কিণ্বন
fluid	স্রাবী

focus	কিরণসমাহার
froth	ফেন
furnace	চুল্লিকা
fusion	স্রাবণ
hermaphrodite	ক্লীব, নপুংসক
heterogeneity	ভিন্নত্ব
homogeneity	সম্মতিত্ব
human body, structure of the	শরীর-সংগ্রহ
inversion	অধোত্তরস্থান
magnet	চুম্বক প্রস্তর
magnetism	চুম্বকপ্রস্তরস্বভাব
materia medica	রোগান্তকসার
menstruum	পুট, দ্রাবক
midwife	ধাত্রী
midwifery	গর্ভান্বেক্ষণ
mobility	জঙ্গমত্ব
oculist	নেত্রবৈদ্য
operation	শস্ত্রবৈদ্য
optics	দৃষ্টিবিদ্যা
pathology	নিদান, রোগাভিজ্ঞান
pharamacopœia	ভৈষজ্যকল্পনাবিধি
pharmacy	ঔষধকল্পনা

philosophy	প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান
physician	ভিষক্, বৈদ্য
physiology	শরীরসূত্র
practice	অভ্যাস
practice of physic	বৈদ্যবৃত্তি
prescription	ঔষধ-পত্র
property	ভৈষজ্যগুণ
putrefaction	সড়ন
quality	ঔষধস্বভাব
rays of light	কিরণ
receiver	গ্রহণযন্ত্র
refraction	ব্যতিভা
repulsion	দূরকরণ, বিকর্ষ
retort	প্রস্রাবী যন্ত্র
science of medicene	বৈদ্যবিদ্যা
science of surgery	শস্ত্রবিদ্যা
sediment	ক্লেদকীট
sensibility	স্বর্ণজ্ঞান
simple	অমিশ্রিত
solid	অস্রাবী, সংযমিত
solution	দ্রবিত
solvent	পুট, দ্রাবক
specific	বিশেষণ

surgeon	শস্ত্রবৈদ্য
surgery	শস্ত্রক্রিয়া
still	ভগযন্ত্র
systole	সঙ্কোচ
technical	সংজ্ঞা, পারিভাষিক
tenacity	নির্য্যাস
theory	ন্যায়তা
tube	নলী
volition	ইচ্ছা, ব্যবস্থা

রাসায়নিক পরিভাষা

পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনা ও প্রচার দুঃসাধ্য হইয়াছে। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে পরিভাষার অভাব কথঞ্চিৎ পূরণের জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

বলা বাহুল্য যে উপযোগী পরিভাষার আশ্রয় না পাইলে কেবল মাত্র প্রচলিত ভাষার সাহায্যে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার বা সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের জন্য প্রণালীবদ্ধ পরিভাষা বর্ত্তমান আছে। সেই পরিভাষা অবলম্বন করিয়া রসায়নবিজ্ঞানের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং রসায়নবিজ্ঞান দিন দিন দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। মহামতি লাবোয়াশিয়া যে দিন আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্ম দান করেন, সেই দিনই উক্ত বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছিল। লাবোয়াশিয়া পরিভাষাগঠন কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত রাসায়নিক পরিভাষাই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছিল; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পরিভাষাই মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। লাবোয়াশিয়াপ্রণীত সেই পরিভাষা বর্ত্তমান না থাকিলে রসায়ন বিজ্ঞানের এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বত্র সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনের সময় লাটিন ও গ্রীক হইতে দুই হাতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের ভাষা সম্বন্ধে ইউরোপের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা একতা

দেখা যায়। এইরূপই হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সহিত দেশগত বা জাতিগত ভেদের সম্বন্ধ যত না থাকে, ততই কল্যাণ। বিজ্ঞানের ভাষা সার্ব্বভৌমিক ভাষা হওয়া উচিত। এরূপ হওয়া উচিত যে, যে কোন দেশের যে কোন পণ্ডিত সেই ভাষায় কথা কহিলে অন্য দেশের পণ্ডিতের যেন তখনই তাহা বুঝিতে পারেন। জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজের মধ্যে ভাববিনিময় নিয়ত আবশ্যক। নতুবা বিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে ঘটে না। ইউরোপে সকল জাতির পণ্ডিতেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলন কালে লাটিন ও গ্রীক ভাষাকে মূলস্বরূপে অবলম্বন করেন; এই জন্য ইউরোপে বিজ্ঞানের ভাষায় অনেকটা একতা দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে যদি কোন কালে ইংরেজি ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষার পাশাপাশি দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তখন বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার আশ্রয় আবশ্যক হইবে না। ইংরেজি পরিভাষাই সশরীরে আমদানি করিলে চলিতে পারিবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষা সেরূপে প্রচলিত ভাষা হইয়া কখন এদেশে দাঁড়াইবে কি না সন্দেহ; ঐরূপ ঘটনা আমাদের স্বজাতির স্পৃহণীয় হইবে কি না, সে বিষয়েও সংশয় আছে। আর দূর ভবিষ্যতে যদি বা সেই ঘটনা সম্ভবপর হয়, সে কালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

সম্প্রতি আমাদের মাতৃভাষাতেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতমূলক। গ্রীক ও লাটিনের সহিত দূর জ্ঞাতিসম্পর্ক থাকিলেও সে সম্পর্কে আমাদের কোন লাভ হইবে না।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারি খানি মাত্র রাসায়নিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তাহাও বালকদের শিক্ষার নিমিত্ত রচিত। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবই এই দুর্দ্দশার কারণ এবং এই কারণেই ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট রসায়নশাস্ত্রের প্রচার ঘটিতেছে না।

বাঙ্গালায় রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের কোন চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই

বলিলেই চলে ; দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র। অধিকাংশ স্থানেই ইংরেজি শব্দ যথাসাধ্য উচ্চারণ ঠিক রাখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ঐ সকল শব্দ বিজাতীয় শব্দ ; বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র তাহাদের উচ্চারণে পরাঙ্মুখ। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। দুরুচ্চার্য্যতা ও শ্রুতিকটুতা দোষে বিজাতীয় শব্দ সাধারণে যথাশক্তি পরিহার করিবে। তাহার উপর ঐ সকল শব্দ আমাদের নিতান্ত অনাত্মায়। যাহারা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালাভ করে নাই, ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ তাহাদের মনে কোনরূপ ভাবের বা অর্থের উদ্রেক করে না। বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয় ; অর্থ আপনা হইতে মনে আসে না। সুতরাং কেবলমাত্র ইংরেজি শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রস্তাব সেই কার্য্যের প্রয়াস মাত্র।

সর্ব্বাংশে অসঙ্গতিহীন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়ন অসাধ্য ব্যাপার। কোন শব্দ কোন কারণে, অন্য শব্দ অন্য কারণে, সঙ্গত বিবেচিত হয়। কোন্‌টি বাছিয়া লইতে হইবে স্থির করা দায়, এবং প্রত্যেকের উপযোগিতা লইয়া চিরদিন বিতণ্ডা চালান যাইতে পারে। সঙ্কলনকারিগণ চিরকাল বিতণ্ডা চালাইবেন, ও অপর সাধারণে দিশাহারা হইয়া তাঁহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে, এরূপ বাঞ্ছনীয় নহে। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, এর চেয়ে উপযোগী শব্দ আর মিলিবে না। আজ একজন

একটা পরিভাষা প্রণয়ন করিলেন, কিছুদিন পরে আর একজন তাহার নানাবিধ অসঙ্গতি নির্দ্দেশ করিয়া আর একটা নূতন পরিভাষা প্রণয়ন করিতে পারেন। নিত্য নূতনের অবতারণা দেখিয়া সাধারণে কর্ত্তব্যমূঢ় হইবে ও শাস্ত্রও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবে।

বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি দোষ হইতে যথাশক্তি মুক্ত করিতে হইবে, ঠিক কথা। সুতরাং ভবিষ্যতের সঙ্কলকগণ নূতন পরিভাষা প্রণয়নে সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু পরিভাষার অন্য গুণ যে পরিমাণে থাক বা নাই থাক, পরিভাষায় স্থায়িত্ব গুণের আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা, অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষা। স্থিতিশীলতা ভাষামাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ভাষা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হইলে তাহাকে আর ভাষা বলা চলে না। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। অধিকন্তু উহা একটা যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক; কালসহকারে তাহার সংস্কার হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়নের জন্য জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্যনাশ মাত্র হইবে। স্থির থাকিলে চলিবে না; অপেক্ষা করিবার সময় নাই। লাবোয়াশিয়া রসায়নের জন্য যে পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত। এমন কি সমস্ত বিজ্ঞানবিদ্যায় ঐ পরিভাষার তুলনা নাই, বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও দোষরহিত বা অসঙ্গতিবর্জ্জিত নহে। এমন কি উহাতে এমন একটা প্রধান দোষ বর্ত্তমান আছে, যাহাতে উহার গোঁড়ায় গলদ। লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যৌগিক পদার্থমাত্রেরই দুইটি ভাগ; দুইটি বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ভাগ একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। লাবোয়াশিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ও তদনুসারে তাঁহার পরিভাষা প্রণয়ন

করেন। লাবোয়াশিয়ার সিদ্ধান্ত তৎকালে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী রসায়নবিদেরা এই সিদ্ধান্ত আরও ফলাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল এই সিদ্ধান্ত অনেকটা উলটাইয়া গিয়াছে। যে সিদ্ধান্ত আশ্রয়ে পরিভাষার রচনা, সে সিদ্ধান্ত এখন নাই, কিন্তু সেই পরিভাষা অদ্যাপি অবলম্বিত রহিয়াছে।

কোনও পরিভাষা যে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। সাহসে ভর করিয়া যথাসাধ্য সঙ্গতি রাখিয়া ও অসঙ্গতি নিবারণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সেই পরিভাষায় মূলগত এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য দোষ লক্ষিত না হয়, তবে সাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহার আশ্রয়ে গ্রন্থরচনা ও জ্ঞানপ্রচার কার্য্য আরব্ধ হইতে পারিবে। তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর গাঁথন চলিতে পারিবে। আবশ্যকমত কালক্রমে তাহাকে সংস্কৃত করিয়া লইলেই চলিবে।

লাবোয়াশিয়া অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন; পরিভাষা প্রণয়নেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই পরিচয় পাই। আমাদের কাজ কেবল অনুবাদমাত্র। ইহাতে প্রতিভাপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদিগকে ইংরেজি পরিভাষা আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের বিশিষ্টতায় দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে মাত্র।

পারিভাষিকত্বের এই কয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ;

১। প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইবে ; তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না।

২। এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে ; দুই শব্দ একার্থবাচী হইবে না।

৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইবে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় প্রচলিত লৌকিক ভাষা হইতে

শব্দ গ্রহণ করিতে হয়; আবার অনেক সময়ে প্রচলিত শব্দের অভাবে নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। প্রচলিত শব্দের একটা দোষ আছে; উহা লোকসমাজে একমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় না। প্রচলিত ভাষার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই পাঁচ সাত দশটা অর্থ থাকে। সুতরাং উহাতে পারিভাষিকত্বের মুখ্য লক্ষণ থাকে না। পারিভাষিকত্ব স্থাপন করিতে গেলে উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঁধিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু অনভ্যাস হেতু সাধারণে সহসা উহাদের পারিভাষিক প্রয়োগ বুঝিতে পারে না। নবকল্পিত অপ্রচলিতপূর্ব্ব শব্দে এই দোষটি ঘটে না। তাহাতে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহা সেই অর্থমাত্রই ব্যক্ত করে। তবে পরিচয়ের অভাবে প্রথমটা কাণে ঠেকিতে পারে; কিন্তু অভ্যাস বলে সহিয়া যায়। কোন স্থানে প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে; কোথাও বা অপ্রচলিত শব্দের কল্পনা করিতে হইবে। অনভ্যাস ও অপরিচয় হেতু প্রথম প্রথম কাণে বাজিবে; অভ্যাস ও পরিচয়ের সহিত সে দোষ থাকিবে না।

ফল কথা, পাঁচ জনে সম্মত হইয়া যে শব্দে যে অর্থ আরোপ করা যায়, সে শব্দের সেই অর্থ। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র। যে কোন অর্থে যে কোন শব্দ ব্যবহার করিতে আমাদের অধিকার আছে; সকলে সম্মত হইয়া যে অর্থ দেওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য।

রসায়ন শাস্ত্রের ইংরেজি পরিভাষাও যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্তের বিচার করিলেই দেখা যাইবে। কয়লা পোড়াইলে যে বায়ু পাওয়া যায়, রসায়ন শাস্ত্রে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট নাম নাই; পাঁচ জনে পাঁচ রকমের নাম ব্যবহার করেন; একই পদার্থের carbonic acid, carbon dioxide, carbonic anhydride এই তিনটি নাম প্রচলিত আছে। আর একটি পদার্থ সোরা; ইহার প্রচলিত নাম দুইটি, nitre আর

saltpetre; রসায়ন গ্রন্থে এই দুইটি নাম অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়; তাহা সেওয়াই nitrate of potash, nitrate of potassium, potassium nitrate, potassic nitrate এইরূপ ঈষদ্ ভিন্ন কয়েকটি নামও যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভেদ শুধু উচ্চারণগত ভেদ নহে, তাৎপর্য্যগত ভেদও বর্ত্তমান আছে। Nitrate of potash নামের সহিত একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জড়িত আছে; সে সিদ্ধান্তটি প্রাচীন; বর্ত্তমানে সে সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া স্থির হইয়াছে। Potassic Nitrate ঐ নামের আধুনিক আকার; সেই পুরাতন ভ্রম সংস্কারের চেষ্টায় এই নাম গৃহীত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় নাম, এমন কি nitre প্রভৃতি লোকমুখে চলিত নামও, আধুনিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি অল্প চেষ্টায় এই যথেচ্ছাচার নিরাকৃত হইতে পারে। তথাপি চলিত প্রথা এমনই স্থিতিশীল যে রসায়ন বিদ্যার গ্রন্থে একই দ্রব্যের এতগুলি নাম আজিও চলিতেছে।

ইংরেজিতে চারিটা নাম বর্ত্তমান আছে বলিয়া বাঙ্গলা অনুবাদের সময় চারিটা নাম খুঁজিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? দোষের অনুকরণ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। একটু সাবধান হইয়া চলিলে এই সকল সামান্য দোষ আমরা পূর্ব্ব হইতেই পরিহার করিতে পারি।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। নতুবা oxygen বাঙ্গলায় অম্লজান হইত না। Carbon dioxide এর বাঙ্গলায় দ্ব্যম্লজনিত অঙ্গার মধুর নহে; উহাতে অন্য দোষও রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে ঐ দ্রব্যের নাম carbonic anhydride; ইংরেজি বহিতে একাধিক নাম আজিও দেখা যায়; বাঙ্গলায় তাহা থাকিবে কেন?

পাশ্চাত্য রসায়ন গ্রন্থে নামকরণ সম্বন্ধে যে প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইব। যে সকল ইংরেজি নাম কেবল প্রাচীনতার বলে ইংরেজি পুস্তকে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিব। নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে একাধিক শব্দ থাকা উচিত নহে ; এই নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন থাকা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাষার ভেদ বিজ্ঞানের উন্নতির অন্তরায় হয় মাত্র। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ভাষা বিভিন্ন, কাজেই স্বজাতির মুখ চাহিয়া জাতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে হয়। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদান কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকল লাটিন ভাষায় লিখিত হওয়া নিয়ম ছিল। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া লাটিনে লিখিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লাটিনে লিখিত হইয়া থাকে। সার জোসেফ হুকার সাহেবের ভারতবর্ষের উদ্ভিদ্‌বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ লাটিনে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ভিন্ন হইলেও গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক নামগুলি অন্ততঃ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে।

সুতরাং রসায়নশাস্ত্রের পারিভাষিক নামগুলি একবারে সশরীরে আমাদের ভাষায় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। ইংরেজি নামগুলি অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া কেবল বাঙ্গলা হরপে বসান উচিত, জোরের সহিত অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন।

রসায়ন শাস্ত্রে প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থের সত্তরটি নাম রহিয়াছে ; তাহা ব্যতীত সেই সত্তরটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সমবায়ে উৎপন্ন শত সহস্র যৌগিক পদার্থের শতসহস্র পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই

শত সহস্র নাম বাঙ্গলায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়া খাঁটি বাঙ্গলা বা সংস্কৃত-মূলক বাঙ্গলা নাম প্রচলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। একে এইরূপ অনুবাদ সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ রসায়নবিজ্ঞানে প্রকৃত অধিকার-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে এখন বাঙ্গলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইতেই হইবে। যদি বাঙ্গলায় কোন ব্যক্তি রসায়ন বিদ্যায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে তাহা ইংরেজি ভাষাতেই প্রচার করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমে কিছু দূর বাঙ্গলা ভাষার অবলম্বনে চলিয়া পরে ইংরেজির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সুতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালী রসায়নবিৎ এক সেট্ ইংরেজি ও এক সেট্ বাঙ্গলা পারিভাষিক শব্দের ভারে মেরুদণ্ড নমিত করিয়া চলিতে থাকিবেন।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে। আপত্তি এই যে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণমাত্রেই ইংরেজের ছেলের মনে একটা ভাবের উদয় করে; কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলের কাণে কেবল একটা ধাক্কা দিয়া যায়, মনের উপর রেখাপাত পর্য্যন্ত করে না। অতএব বাঙ্গালীর ছেলের জন্য অনুবাদই আবশ্যক। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বেলায় সে আপত্তি টিকেবে না। মনে কর, একটি ধাতুর ইংরেজি নাম Ruthenium; ইংরেজের ছেলেই বল আর বাঙ্গালীর ছেলেই বল, যে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এই শব্দের উচ্চারণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না। Ruthenium শব্দে হাতী কি ঘোড়া কি গাছ, কিছুই তাহার মনে আসে না। ঐ শব্দটি রসায়নবিৎ পণ্ডিতের সৃষ্টি; প্রচলিত ভাষায় উহার কস্মিন্ কালে ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার সহিত ইংরেজের ছেলের ও বাঙ্গালীর ছেলের তুল্য সম্বন্ধ। সুতরাং উহা যখন ইংরেজিতে চলিবে, তখন

বাঙ্গলায় চলিবে না কেন ? বাঙ্গলায় আবার উহার অনুবাদের প্রয়োজন কি ? উহাকে অক্ষরান্তরিত করিলেই যথেষ্ট।

স্বদেশী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া পারিভাষিক শব্দের প্রণয়নে অবশ্য একটা বাহাদুরী আছে। আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এই কার্য্যে একটা অদ্ভুত পরাক্রম ছিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, ব্যাকরণ বা অলঙ্কার বা গণিত বা জ্যোতিষ বা চিকিৎসা, যে কোন শাস্ত্রেই দেখা যায়, পারিভাষিক শব্দের ছড়াছড়ি। শাস্ত্রকর্ত্তারা অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া শতে শতে সহস্রে সহস্রে পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। সময়ে সময়ে নির্ব্বাচন প্রণালী ও সঙ্কলন প্রণালীর মৌলিকতা ও কার্য্যকারিতার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে হল্ হস ণিচ্ ক্বিপ্ লট্ লোট্ প্রভৃতি যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মৌলিকতার ও তাহাদের কার্য্যকারিতার তুলনা কোথায় ? অথচ স্থলান্তরে দেখিতেছি যে পারিভাষিক শব্দপ্রণয়নে এই অতুল পরাক্রম বর্ত্তমান থাকিতেও প্রাচীন জ্যোতিষীরা যাবনিক ভাষা হইতে বিস্তর পারিভাষিক শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদেরও সেই প্রথা অবলম্বনে দোষ হইবে কেন ?

তবে আর একটা কথা আছে। সত্তরটা মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ এ দেশের জনসমাজেও বহুদিন হইতে পরিচিত এবং তাহারা আমাদের সাংসারিক কার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কয়লা, গন্ধক, সোণা, রূপা, লোহা ইত্যাদি। এই সমুদয় পরিচিত পদার্থের খাঁটি বাঙ্গলা নাম কেহই ত্যাগ করিবে না। রূপার মত পরিচিত পদার্থটিকে সিলবার বা আর্জেণ্টম বলিতে নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ হইবে।

এতদ্ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াসকলের এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার হয়, উহাদের পারিভাষিক নামের

অনুবাদ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপে oxidation, combustion, reduction, solution, distillation প্রভৃতির এবং যন্ত্রের দৃষ্টান্ত স্বরূপে retort, flask প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের খাঁটি বাঙ্গলায় অনুবাদ আবশ্যক। এখানে শব্দগুলি অক্ষরান্তরিত করিলে চলিবে না। যুক্তিপ্রয়োগ অনাবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণির পারিভাষিক শব্দ আছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে ইহারা class names, দ্রব্যের জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক নাম। উদাহরণ,—element, compound, metal, alloy, acid, base, salt, fat, oil, ইত্যাদি। ইহাদেরও অনুবাদ আবশ্যক ; হরপ বদলাইলে চলিবে না।

এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল, যে রসায়ন শাস্ত্রে মূল পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ সকলের যে সকল নাম রহিয়াছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে proper noun, তাহাদের মধ্যে সুপরিচিত ও সুলভ পদার্থগুলি বাদ দিয়া অপরের জন্য কেবল ইংরেজি নাম অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। গ্রীকেরা উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমাদের চন্দ্রগুপ্তকে অক্ষরান্তরিত করিয়া Sandracottusএ পরিণত করিয়াছিলেন, এবং চীনবাসীরা রাঙ্গামাটিকে লোচোমোচি তে পরিণত করিয়াছিলেন। Sandracottus যে চন্দ্রগুপ্ত, এবং লোচোমোচি যে রাঙ্গামাটি, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতে পণ্ডিতদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি এক জাতির লোকের নাম অন্য জাতির ভাষায় লিখিবার সময় কেবল উচ্চারণসৌকর্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে গেলে ঘোর বর্ব্বরতা হইয়া দাঁড়ায়; তাহাতে জ্ঞানের পথে অনর্থক কাঁটা দেওয়া হয়। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দ অক্ষরান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ, অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে সেই শব্দটি

প্রচলিত আছে, সেই জাতির লোকে তাহাকে যেরূপে উচ্চারণ করে, ঠিক্ সেই উচ্চারণ যাহাতে অবিকৃত থাকে, এই উদ্দেশ্যে বানানের এই নিয়মগুলি অবধারিত হয়। তর্ক উঠিবে যে বৈজ্ঞানিক শব্দের বানানে বৈজ্ঞানিকতারক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইংরেজি শব্দ অক্ষরান্তরিত করিবার সময় এইরূপ কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে চলা উচিত কি না?

এই তর্কের উত্তর আছে। বাঙ্গলায় পরিভাষা সঙ্কলনের উদ্দেশ্য কি? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে দুই চারিখানি রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ যথাশক্তি অবিকৃত রাখিয়া তাহাদিগকে অক্ষরান্তরিত করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। কার্ব্বন ডাই-অক্‌সাইড্, সলফেট্ অব্ পটাশ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় প্রচলিত রাসায়নিক গ্রন্থে ও ডাক্তারি গ্রন্থে প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু এই সকল শব্দ বাঙ্গালীর কর্ণ এরূপ তীব্রভাবে ভেদ করে, যে জ্বররোগীর কুইনীন্ সেবনের ন্যায় ঐ গুলিকে কোনরকমে কষ্টেস্থষ্টে মস্তিষ্কসাৎ করা হয় মাত্র। ঐরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলে বাঙ্গালী চিরদিন রসায়নশিক্ষা একটা দৈবনিগ্রহ স্বরূপ গণনা করিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং পুরাতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক ও শব্দশাস্ত্রজ্ঞদের নির্দ্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অন্য পন্থা দেখিতে হইবে। বিজাতীয় শব্দগুলির শ্রুতিকটুতা দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। কঠোর শব্দগুলিকে কোমল ও মোলায়েম আকার দিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আনিতে হইবে।

পুরাকালে এদেশেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। যাবনিক Helios শব্দ হেলি এবং Aphrodite আস্ফুজিৎ আকারে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখা দেয়। Heliocentric শব্দ হেলিকেন্দ্রক আকার গ্রহণ করিয়া ঠিক আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় শুনায়। অথচ উভয় শব্দের ঐক্যনির্ণয়ে কোন কষ্ট হয় না। সংস্কৃত কাস্তীর শব্দ যাবনিক kassiteros

শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াও কেমন সংস্কৃতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যাবনিক ভাষার জ্যোতিষিক শব্দ সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়া কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার একটি তালিকা দিয়াছি; এস্থলে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য আমরা সেই প্রাচীনকালের জ্যোতিষীদের অবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ করি।

পাশ্চাত্য ভাষায় মূল পদার্থের নামকরণ ব্যাপারে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বিত হয় নাই। যাহার যা ইচ্ছা, তিনি সেই নাম দিয়াছেন; এবং সেই নামই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। পদার্থের গুণানুসারে নামকরণের চেষ্টা কয়েক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ Oxygen =অম্লোৎপাদক, Hydrogen=জলোৎপাদক, Rubidium=লোহিতক (যাহা বাষ্পাবস্থায় লোহিতবর্ণের আলো উৎপাদন করে); ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নামকরণ ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়াল ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। নামকরণ ব্যাপারই সর্ব্বত্র খেয়ালের উপর স্থাপিত; কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন রাখিতে কোন আইনে নিষেধ নাই। উদাহরণ;—পারদের নাম Mercury; বুধগ্রহের সহিত উহার একটা কাল্পনিক অথচ অমূলক সম্বন্ধ অনুসারে এই নাম। ধাতুবিশেষের নাম Cerium; সেই বৎসর Ceres নামক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই সূত্রে। ধাতুবিশেষের নাম Cobalt অর্থাৎ একজাতীয় উপদেবতার নামানুসারে।

ফল কথা, নামের সহিত পদার্থের গুণের বা ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিবার দরকার নাই; সুতরাং সেই সেই নামের অর্থ ধরিয়া অনুবাদের চেষ্টা ব্যর্থ পরিশ্রম। Oxygen ও Nitrogenএর অনুবাদে অম্লজান ও যবক্ষারজান এই দুই নামের কল্পনা কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না। ঐরূপ অনুবাদের কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল না।

পদার্থ সকলের ইংরেজি নামের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাদিগকে কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১। কতকগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়নবিজ্ঞানের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বেই জনসমাজে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের খাঁটি ইংরেজি নাম বিজ্ঞানের ভাষাতেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ gold, silver, sulphur, iron প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল যৌগিক পদার্থে তত্তৎ মূল পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের নামকরণ কালে উহাদের ইংরেজি নামের পরিবর্ত্তে লাটিন নাম ব্যবহারে সুবিধা হয়। যেমন, *auric* acid, *argentic* nitrate, *ferrous* sulphate ; ইত্যাদি।

২। রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর যে সকল মূল পদার্থ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতিপয় স্থলে তাহাদের কোন না কোন একটি গুণ অবলম্বন করিয়া নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ, Oxygen, Chlorine, Iodine, Phosphorus, Potassium, Calcium.

২। তদ্ভিন্ন অপরত্র কোন একটা কল্পিত ব্যাপার অনুসারে খেয়ালের উপর নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণ, Tellurium, Cobalt, Gallium, Germanium ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় নামকরণ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্র অনুসারে চলা যাইতে পারে।

১। পরিচিত পদার্থের মধ্যে যাহাদের নাম ভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেই সেই নাম বজায় রাখা যাইবে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, পারদ ইত্যাদি।

২। যে কয়টি নূতন নাম বাঙ্গলা ভাষায় কিছু পূর্ব্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা যাইবে। অম্লজান, যবক্ষারজান, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ আপত্তি না থাকিলে উহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে।

৩। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র কেবল ইংরেজি শব্দ অক্ষরান্তরিত করা যাইবে। তবে উচ্চারণে সুবিধার জন্য কাটিয়া ছাঁটিয়া শব্দগুলিকে মোলায়েম করিয়া লওয়া হইবে। শব্দগুলি শ্রুতিসুখ হওয়া দরকার; বাঙ্গলা ভাষার ধাতুর সহিত না মিশিলে কোন শব্দ গ্রাহ্য হইবে না।

আবার বলিতেছি, যে পারিভাষিক নামের অধিকাংশই খেয়ালের উপর আবিষ্কৃত, সুতরাং তাহাদের কোন সার্থকতা নাই। কাণা পুত্রের পদ্মলোচন নামের যেমন সার্থকতা নাই, সেইরূপ অধিকাংশ মূলপদার্থের নামেরও কোনরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইবে না। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত পরিভাষা সঙ্কলনের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে নামের সার্থকতা রক্ষার জন্য একটা উৎকট প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য এতটা পরিশ্রমের কোন দরকার ছিল না। পারিভাষিক নামের সার্থকতা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

বাঙ্গলার প্রথম রসায়নগ্রন্থ

কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়ন গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা-সাহিত্য ইংরেজ মিশনারিদের নিকট নানা-কারণে ঋণী। এই গ্রন্থখানিও মার্শমান প্রভৃতি মিশনারিদের প্রযত্নেই প্রচারিত। গ্রন্থের নাম Principles of Chemistry by John Mack of Serampur College—কিমিয়া বিশ্বার সার, শ্রীযুত জান মাক সাহেব কর্ত্তৃক রচিত ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। গ্রন্থখানি শ্রীরামপুর যন্ত্রে ১৮৩৪ অব্দে মুদ্রিত। বর্ত্তমান পুস্তক ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল কি না, জানি না।

ডিমাই বার পেজী আকারে গ্রন্থের পৃষ্ঠসংখ্যা ১৯—১৬৯। প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও স্থচি আছে। ভূমিকা ইংরেজিতে লিখিত। স্থচি ইংরেজি ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের দুই ভাগ; প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ‘কিমিয়া-প্রভাব’—chemical forces;—যথা, “আকর্ষণ”, “তাপক”, “আলো”, “বিদ্যুতীয় সাধন”,—বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—“কিমিয়া-বস্তু”—chemical substances; তন্মধ্যে দুই অধ্যায়ে “বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু” (electro-negative substances), এবং “ধাতু-ভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু”

(unmetallic electro-positive substances), বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অন্য সমুদয় মূল পদার্থকে, অর্থাৎ non-metal দিগকে, এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণি-বিভাগ আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রথম শ্রেণি বা electro-negative শ্রেণি মধ্যে Oxygen, Chlorine, Bromine, Iodine, Fluorine, স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বা electro-positive শ্রেণির মধ্যে Hydrogen, Nitrogen, Sulphur, Phosphorus, Carbon, Boron, Selenium স্থান পাইয়াছে! গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ধাতু সকলের ও জৈব পদার্থের—"সেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় বস্তু" সকলের—বিবরণ থাকিবে, গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আভাস আছে। গ্রন্থশেষে "ক্রোড়পত্র" (appendix) মধ্যে চিত্র-সহিত বাষ্পীয় এঞ্জিনের ব্যাখ্যা আছে।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূমিকা মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য আছে,—"Mr. Marshman having proposed some years ago to publish an original series of elementary works on history and science, for the use of youth in India, I thought it a privilege to be associated with him in the undertaking and cheerfully promised to furnish such parts of the series as were more intimately connected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History; and now, at length, I am permitted to add to it this first volume of the Principles of Chemistry."

গ্রন্থকার শ্রীরামপুর কালেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

শ্রীরামপুর কালেজে তৎকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কটলণ্ডনিবাসী জেম্‌স্ ডগ্‌লাস্ যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ পাঁচশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন; তজ্জন্য গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ, বস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গলা গ্রন্থপ্রচার গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় কতদুর সফল হইয়াছিল, জানি না। শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় গ্রন্থকার রসায়ন সম্বন্ধে যে লেক্‌চার দিতেন, তাহারই অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "Be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour; and their own tongue is the great instrument by which we hope te enlighten them." গ্রন্থকার এক জায়গায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দিতেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গলা ভাষার দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষা চলিতে পারে না। বাঙ্গলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যিনি সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সভাপতির আসন হইতে সে দিন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতৃস্তন্যের স্থানীয় বটে; কিন্তু জননী বহুদিন হইতে রুগ্না; তাঁহার স্তন্য এখন বিষবৎ পরিহার্য্য। পাঠকেরা অবধান করুন।

এই গ্রন্থখানির অধ্যয়নে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের শৈশব ছিল। তখন যাহা অস্পষ্ট ছিল, এখন তাহা স্পষ্ট। তাপ তখনও দ্রব পদার্থ মধ্যে গণ্য হইত; আলোক কণিকাবৃষ্টি হইতে উৎপন্ন, এ বিশ্বাস তখনও যায় নাই; তাড়িতের অধিকাংশ ধর্ম্মই অজ্ঞাত ছিল; ডাল্টনের পরমাণুবাদ আঁধারে আলো দিতে গিয়া আঁধারকে আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল; অধিকাংশ মূল পদার্থের

পারমাণবিক গুরুত্ব তখনও নির্ণীত হয় নাই; নাইট্রজেনের এক পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পাঁচ পরমাণু যোগে নাইট্রিক দ্রাবক জন্মে; এইরূপ নানাবিধ তত্ত্ব তখন রসায়নজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। এখন সে সমস্ত মত বদলাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এখনও অপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে বাঙ্গালায় রসায়নশাস্ত্রের যে অবস্থা দেখিতে পাই, তাহার অপেক্ষা বড় অধিক উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাই না।

গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্ব্বতন বাঙ্গালা, গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান; গ্রন্থকার ইংরেজ। সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাঙ্গালা ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি বিবিধ বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য প্রচারে এখনও সাহসী হয় নাই। এখনও বৈজ্ঞানিকের বাঙ্গলা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। যাঁহারা বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এবিষয়ে বাঙ্গলা ভাষার দৈন্য বুঝিতে পারেন। এখনও এই অবস্থা! সত্তর বৎসর পূর্ব্বে একজন বিদেশী কিরূপে এই ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। বিদেশীর যে সাহস ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাকিলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অদ্যাপি এরূপ দুরবস্থা থাকিত না।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই এই শিক্ষা হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা।" ৩ পৃঃ।

"কিমিয়া প্রভাব চারি প্রকার। ১ আকর্ষণ। ২ তাপক। ৩

আলোক। ৪ বিদ্যুতীয় সাধন। অনুমান হয় যে অপর একপ্রকার চুম্বকীয় গুণ।" ৫ পৃঃ।

"দ্রব হওন কালে কতক তাপক দ্রব বস্তু মধ্যে লীন হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা দ্রব বস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক।" পৃঃ ৩১।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে আছেন এবং তাঁহার অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোকসকলকে সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন, ঐ সকল প্রমাণেতে তাঁহাকে স্তুতিবাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃঃ।

"আলোকের চালন ও কার্য্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে এক প্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বস্তু নহে, কেবল বস্তুর মধ্যগত একপ্রকার বিশেষ সংলড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃঃ।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে, তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোক চলত বাধিত কিম্বা অন্যদিগে পরাবর্ত্তিত হইতে পারিবেক।" ৫০ পৃঃ।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থ অক্সিজনের দ্বারা তাবৎ জীব জন্তুর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ব্যবস্থার কর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমাদের ভদ্রদ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃঃ।

"সোদিয়ামের ক্লোরিণ অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুড়াকৃত মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদের ৩ ঔন্স হামানদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া, তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সে মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্পে অল্পে উত্তপ্ত কর, তাহাতে ক্লোরিণ আকাশ নির্গত হইবে।" ৭২ পৃঃ।

এই যথেষ্ট। এ কালে লিখিত কোন কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তকের ভাষার সহিত মিলাইলে এই ভাষাকে বড় বেশী দুর্ব্বোধ মনে হইবে না।

রসায়ন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে আধুনিক গ্রন্থকারদের যে সমস্যা উপস্থিত হয়, মাক্ সাহেবেরও তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengalee literature and domesticate its terms and ideas in this language. The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no small difficulties * * * * The names of chemical substances are, in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language ; as they were but a few years ago to all languages. The chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sanskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin do to the English. * * * I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, merely changing the prefixes and teminology, so as decently to incorporate the new words into the language."

কটক কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রণীত "সরল রসায়ন" বোধ করি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত রসায়ন সম্বন্ধে শেষ গ্রন্থ। ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮৯৮। এই গ্রন্থেও স্থূলতঃ মাক্ সাহেবেরই প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

* ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া উচিত, কি তাহাদের অনুবাদ আবশ্যক, এই কথা লইয়া তর্ক আছে। রসায়ন

শাস্ত্রে যে হাজার হাজার পারিভাষিক নাম প্রচলিত আছে, তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এ বিষয়ে দ্বিরুক্তির সম্ভাবনা নাই। তবে অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দগুলিকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া মোলায়েম করিয়া লইতে হইবে। মাক্ সাহেব তাহাই করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও সেইরূপ কাটা ছাঁটার পক্ষপাতী ছিলেন। যোগেশ বাবু কোন স্থানেই অনুবাদে সম্মত নহেন; অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে অধিক কাটাছাঁটার ও পক্ষপাতী নহেন। অন্ততঃ তাঁহার রসায়ন গ্রন্থ দেখিলে সেইরূপই বোধ হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পণ্ডিতদিগের জন্য অর্থাৎ খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য, সে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা সকলের পক্ষেই জ্ঞাতব্য; সেইটুকু না জানিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হয়, তাহা নহে, সে টুকুর জ্ঞান জীবনরক্ষা ও সংসারযাত্রার জন্যও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোকশিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় করাইতে হইলে বিজ্ঞানের ভাষাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। উৎকট পারিভাষিক-শব্দ-ভীষণ ভাষা পণ্ডিতদের জন্য। সাধারণকে বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে পারিভাষিকত্ব যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ভাষাকেও সুশ্রাব্য ও মোলায়েম না করিলে চলিবে না। তথাপি বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞান, তখন উহার পারিভাষিকত্ব কতকটা থাকিবেই। সেই

পারিভাষিকতা যদি আবার শ্রুতিকঠোর দুরুচ্চার্য্য বৈদেশিক ভাষা আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। প্রায় আশী বৎসর হইল, বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম রসায়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও বাঙ্গালীর নিকট রসায়নশাস্ত্র একবারে অপরিচিত; ইহার অন্যতম কারণ এই যে, যে ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে; কোন কালে তাহা বাঙ্গালীর ভাষা হইবে না। যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে বাঙ্গালী জনসাধারণ এককালে ইংরেজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে, তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকিবে না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গলার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজি ধরুক্, সে আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রবেশ করিতেও পারে না। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজির স্থানে বাঙ্গলা আসিয়া বসিবে, আমি বরং সেই দিনের আশা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে দিন শীঘ্র আসিবে না; কিন্তু আমাদের চেষ্টার অভাবে যদি সে দিন না আসে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষায় ধিক্!

যোগেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গলা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভাষাকে মৃতভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।" আমি বাঙ্গলা ভাষাকে মৃত ভাষা করিতে চাই না; সংস্কৃতকে অকারণে বর্জ্জন করিতেও আমি প্রস্তুত নহি। সংস্কৃতে অনুবাদ যেখানে অসাধ্য, সেখানেই সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে আমার আপত্তি। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার একটা ধাতু আছে; একটা genius আছে; তাহার সহিত না মিশিলে কোন শব্দ চলিবে না। প্রাচীন আচার্য্যেরা গ্রীকগণের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিখিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাশির নামের জন্য ক্রিয় তাবুরি প্রভৃতি এক সেট্ গ্রীক শব্দ গৃহীত

হইয়াছিল ; কিন্তু সে নামগুলি চলে নাই। Kriosকে ছাঁটিয়া ক্রিয়, Taurosকে ছাঁটিয়া তাবুরি, Aphroditeকে মোলায়েম্ করিয়া আস্ফুজিৎ, করা হইয়াছিল ; নতুবা সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট ধাতুর সহিত ঐ সকল শব্দের সঙ্গতি একেবারেই ঘটিত না। এই সঙ্গতির জন্য ইংরেজেরা সিপাহী শব্দকে সেপাই করিয়া লইয়াছেন ; আমরা schoolকে ইস্কুল, screwকে ইস্ক্রুপ, tableকে টেবিল করিয়া লইয়াছি। এইরূপ কাটা ছাঁটা না করিলে ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না ; বিদেশী শব্দ বিদেশী থাকিয়া যায় ; স্বদেশীর সহিত মিশিতে পারে না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। মাক্ সাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতির ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রণেতাদের প্রয়োজনে আসিতে পারে ; তা ছাড়া অনেকগুলি শব্দ যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের একটি তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

chemistry	কিমিয়া-বিদ্যা
optics	দৃষ্টি-বিদ্যা
heat	তাপক
temperature	তাপ
light	আলোক
electricity	বিদ্যুতীয় সাধন
magnetism	চুম্বকীয় গুণ
element	মূল বস্তু
compound	সঞ্চয় বস্তু
combination	লয়
combining weight	লয়যোগ্য ভাগ
equivalent	তুল্য ভাগ

atom	পরমাণু
atomic weight	পরমাণু সম্পর্কীয় ভার
law	ব্যবস্থা
analysis	ব্যস্তকরণ
synthesis	সমস্তকরণ
force	প্রভাব
attraction	আকর্ষণ
cohesion	সংলাগাকর্ষণ
gravity	গুরুত্বাকর্ষণ
mass	রাশি, বস্তু
volume	অবয়ব, রূপ, পরিসর
solid	কঠিন
liquid	দ্রব
gas	আকাশ
gaseous	আকাশীয়
vapour	বাষ্প
common air	সামান্য আকাশ
standard	পরিমাপক
specific gravity	স্বাভাবিক গুরুত্ব
solution	গলন
crystal	স্ফটিক
water of crystallisation	স্ফটিক জল
deliquescent	গলনশীল
property	গুণ
decomposition	বিভাগ

density	নিবিড়ত্ব
pressure	চাপন
barometer	বারোমেতর
thermometer	তেরেমোমেতর
surface	মুখ
tetrahedron	ঘনাষ্টমুখ
experiment	পরীক্ষা
saturation	প্রচুরতা
proportion	ভাগ
denominator	হারক
movement	সংলড়ন
expansion	বৃদ্ধি
melting	দ্রবত্ব
evaporation	বাষ্পীভাব
ignition	অগ্নিভাব
freezing point	জমাট অংশ
boiling point	স্ফোটন অংশ
contraction	সঙ্কোচন
melting ice	গলনীয় বরফ
freezing water	জমনীয় জল
elasticity	স্থিতিস্থাপনীয় শক্তি
combustion	দহন
supporter of combustion	দহন পোষক
radiation	কিরণত্ব
source	আকর

sea-level	সমুদ্রজলতুল্য উচ্চস্থান
conductor	তাপ সঞ্চারক
metal	ধাতু
equator	রেখাভূমি
pole	কেন্দ্র
lens	মৃদঙ্গাকৃতি বস্তু
specific heat	স্বাভাবিক তাপক
heat capacity	তাপকধারণ শক্তি
latent heat	অব্যক্ত তাপক
sensible heat	ব্যক্ত তাপক
condensation	ঘনসার সম্পাদন
pump	বোমা
air pump	আকাশ বোমা
pure	নির্ভাঁজ
alloy	কুধাতু
salt,	লবণ
acid	অম্ল
alkali	ক্ষার
retort	রিটোর্ট
friction	ঘর্ষণ
reflection	পরাবর্ত্তন
orange	নারাঙ্গী
indigo	বাগুনীয়া
violet	বিওলা
solar spectrum	সৌরব্যস্তবর্ণ

positive	স্বভাবরূপ
negative	অভাবরূপ
positive pole	স্বভাবি পার্শ্ব
negative pole	অভাবি পার্শ্ব
cell	কেটুয়া
battery	মুর্চ্চা
conductor	সঞ্চারক
non-conductor	অসঞ্চারক
insulated	অলগ্ন
electric machine	বিদ্যুতের কল
leyden-jar	লেইডেন পাত্র
spark	স্ফুলিঙ্গ
quantity	যতিতা
intensity or tension	তেজ
dispersion	ভিন্নীকরণ
amber	কহরুবা
electrometer	বিদ্যুন্মাপক যন্ত্র
valtaic pile	বল্‌তার স্তম্ভ
steam engine	বাষ্পীয় কল
boiler	হাঁড়ি
cylinder	চুঙ্গি
beam	আড়া
furnace	অগ্নিকুণ্ড
safety valve	রক্ষক কপাট
tank	কুণ্ড

piston	পালিস
condenser	জমায়ন পাত্র
handle	হাতোল
lever	তরাজ্‌
fulcrum	থাল
fly-wheel	মহাচক্র
electro-nagative substanse	বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু
electro-positive substance	বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু
organic	সেন্দ্রিয়
strong acid	শক্ত অম্ল
dilute acid	দুর্ব্বল অম্ল
ash	ভস্ম
volatile	উড্ডীয়মান
neutralise	পরিতৃপ্ত করা
bleaching	শুক্লকরণ